কুণ্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দ্যেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পাবেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন -

subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

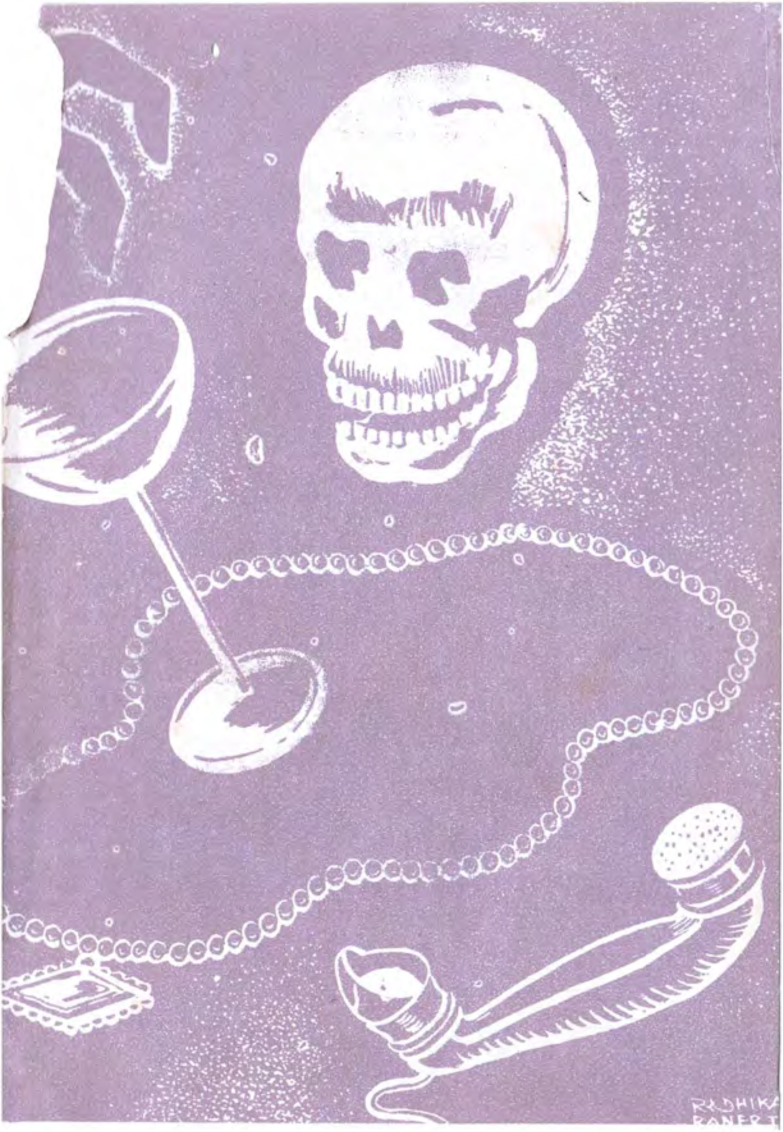
RADHIKA

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনিত, মে, ১৯৬২

'প্রহেলিকা-সিরিজের' ২১নং গ্রন্থ

গ্রহের ফের

মেয়েদের জন্য ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

"কৃষ্ণা সিরিজ ও কুমারিকা সিরিজ" প্রণেতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

প্রণীত

কল্যাণীয়া—

"পূরবী, দীপু, শীলা, রেবা ও সেবা—"

এই বইখানা তোমাদের দিচ্ছি। তোমরা সবাই, এমন কি সেবা পর্য্যন্ত পড়তে শিখেছো ; কাজেই বেশ জানছি, আমার এই বইখানা তোমাদের কাছে আদর পাবে। পড়ে তোমাদের মতামত আমায় জানিয়ো কিন্তু।

কলিকাতা,
২৯।৮।৫২

তোমাদের পিসীমা ও
সেবুর মাসীমা

গ্রহের ফের

এক

সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকার তখন সবেমাত্র ধরার বক্ষে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

খেলার মাঠের ভীড় কমিয়া গিয়াছে, কোলাহলও মিলাইয়া আসিয়াছে। প্লেয়ারেরা প্রায় চলিয়া গিয়াছে, দুই-একজন মাত্র রহিয়াছে।

কৃষ্ণা একপাশে একখানা বেঞ্চের উপর তখনও বসিয়া ছিল, পাশে ছিল একটি ছেলে—বয়স চৌদ্দ কি পনেরো হইবে।

ছেলেটি স্থানীয় এস-ডি-ও মিঃ অতুল মিত্রের একমাত্র সন্তান দেবু,—কৃষ্ণা ইহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছে।

পূজার দীর্ঘ অবকাশ, কলেজ-স্কুল সবই বন্ধ। কৃষ্ণা স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে আই-এ পড়িতেছে। সম্প্রতি ছুটি হইয়াছে, কলিকাতায় ছুটির সময় সে থাকিতে পারে নাই।

অতুল মিত্রের বাড়ী কৃষ্ণাদের বাড়ীর ঠিক পাশে, তিনি কৃষ্ণার পিতার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। পিতৃমাতৃহীনা এই মেয়েটিকে তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই খুব স্নেহ করিতেন। কলিকাতায় থাকিতে মিসেস্ মিত্র প্রায়ই কৃষ্ণাকে নিমন্ত্রণ করিয়া

খাওয়াইতেন, তাহাদের বাড়ী যাওয়া-আসা করিতেন। কৃষ্ণা তাঁহাকে মায়ের মত ভালোবাসিয়াছিল।

সবচেয়ে কৃষ্ণাকে ভালোবাসিয়াছিল দেবু; সে কৃষ্ণার অলৌকিক কীৰ্ত্তিকাহিনী শুনিয়া তাহার একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সাধারণতঃ সে যে-সব মেয়েকে চারিদিকে দেখিতে পায়, কৃষ্ণা তাহাদের অন্তর্গত ছিল না এবং এইখানেই ছিল কৃষ্ণার বৈশিষ্ট্য।

দেবু পিতামাতার নিকট গল্প শুনিয়াছে কৃষ্ণা খুব ভালো মোটর চালাইতে জানে, পাকা ঘোড়-সওয়ারও তাহার নিকট পরাজিত হয়, রিভলভার ছুঁড়িতে সে সিদ্ধহস্ত। মেয়ে হইলেও সে পুরুষের মত অসীম শক্তি ও সাহসের অধিকারিণী,—ইত্যাদি ইত্যাদি শুনিয়া বালক দেবু এই মেয়েটিকে সত্যই ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে, কৃষ্ণার যে-কোন কাজ সে সম্ভ্রমের চোখে দেখে।

কৃষ্ণা কাল মাত্র এখানে আসিয়াছে, দেবু কালই কৃষ্ণার নিকট গল্প শুনিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল, কিন্তু মা তাহাকে ধমক দিয়া নিরস্ত রাখিয়াছেন। কৃষ্ণা এখানে যখন আসিয়াছে, দিন-কয়েক থাকিবে, তখন যথেষ্ট গল্প দেবু শুনিতে পাইবে। মানুষটা কেবলমাত্র ট্রেণ হইতে নামিয়াছে, এখনই জ্বালাতন করা মোটেই উচিত নয়, ইত্যাদি বলিয়া তিনি দেবুকে বুঝাইয়াছেন।

আজ সকালের দিকে গল্পটা কেবল সুরু হইয়াছিল,

এমনই সময় মাষ্টার আসিয়া সব নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর সমস্ত দিন সে-সব গল্প শুনিবার অবকাশ হয় নাই, কৃষ্ণা সর্ব্বদা মায়ের নিকটে থাকায় দেবু তাহাকে উত্যক্ত করিবার সাহস পায় নাই; এই সন্ধ্যায় বেড়াইতে আসিবার সময় সে কৃষ্ণাকে পাইয়া বসিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত সহপাঠীদের কাছে কৃষ্ণার সম্বন্ধে তাহার অনেক গল্প করা হইয়াছে। তাহাদেরই মধ্যে দু-একজন কাল কৃষ্ণার সহিত দেখা করিতে আসিবে, সেজন্য আজ দেবুর ব্যস্ততার সীমা নাই,—সব কথা কৃষ্ণাকে আজই তাহার জানাইয়া রাখা দরকার—নচেৎ কাল তাহাকে বন্ধুদের নিকট অপদস্থ হইতে হইবে।

দেবু সেবার যখন পিতার সহিত কলিকাতায় গিয়াছিল, কৃষ্ণা তখন রেঙ্গুনে গিয়াছিল; ইচ্ছা থাকিলেও, সে না থাকায় দেবু তাহাকে দেখিতে পায় নাই। উপযাচক হইয়া সে নিজেই কৃষ্ণাকে দু-তিনখানা পত্র দিয়াছে—এবার পূজার ছুটিতে কৃষ্ণাদি'কে বসিরহাটে আসিতেই হইবে, না আসিলে দেবু অত্যন্ত কষ্ট পাইবে—ইত্যাদি। সেই পত্রেরই শেষের দিকে মিসেস্ মিত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন—এখানে আসা চাই কৃষ্ণা, দেবু বড় হইয়া তোমায় দেখে নাই; যদি তুমি না এসো, সে নিজেই কলিকাতায় যাইবে।

দেবু প্রলোভন দেখাইয়া লিখিয়াছিল—কলিকাতা হইতে বসিরহাট বেশী দূর নয়, খুব কাছে। কৃষ্ণাদি' বাংলার পল্লীগ্রাম

কোনদিন দেখেন নাই, এখানে আসিলে অনেক কিছু দেখিতে পাইবেন—অনেক কিছু নূতন জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন।

কৃষ্ণা আসিয়াছে, দেবুর সহিত পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠভাবে হইয়াছে। দেবু একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার জ্ঞাতব্য বিষয় সবগুলি জানিয়া লইয়াছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘন হইয়া আসিতেছিল, কৃষ্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "আর না দেবু, এবার চল, বাড়ী যাই; আর দেরী করলে তোমায় আবার মাষ্টার-মশাইয়ের কাছে বকুনী খেতে হবে।"

—"বকুনী!"

কথাটা দেবু হাসিয়া উড়াইয়া দিতে গেলেও পারিল না।

বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কৃষ্ণা বলিল, "আজ আর নয়, কাল রবিবার আছে, তোমার ছুটি, বন্ধুদের নিয়ে এসো—অনেক গল্প করা যাবে। বুঝলে?"

দেবু উৎসাহিত হইয়া বলিল, "কিন্তু তোমাকেও কাল আমাদের সঙ্গে যেতে হবে কৃষ্ণাদি'! আমার বন্ধুরা তোমায় নিমন্ত্রণ করবার জন্যে আসবে,—তখন কিন্তু তুমি না বলতে পারবে না।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া কৃষ্ণা বলিল, "নিমন্ত্রণ আবার কিসের? কোথায় যেতে হবে তোমাদের সঙ্গে?"

দেবু বলিল, "কাল আমরা পিক্‌নিক্ করতে যাব কি না! নদীর ধারে পিক্‌নিক্ হবে, তোমাকেও সেখানে যেতে হবে।

আমাদের স্কুলের দু-চারজন মাষ্টার থাকবেন, আর থাকব আমরা,—প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন স্কুলের ছেলে। বিশেষ করে আমি যখন থাকব দিদি, তোমার এতটুকু অসুবিধে হবে না— আগে হতেই বলে রাখছি!"

কৃষ্ণা বালকের কথা শুনিয়া হাসিল। বলিল, "তাই কি হয় ভাই? আর কোন মেয়ে যখন ওতে থাকবে না, আমার একা যাওয়া কি উচিত?"

দেবু কৃষ্ণার হাতখানা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল; বলিল, "বাঃ, কোন মেয়ের সঙ্গে বুঝি তোমার তুলনা হতে পারে? তোমার মত কোন্ মেয়ে কাজ করতে পারে—এই যেমন—যেমন—"

কৃষ্ণা তাহাকে বাধা দিল—"থাক্, আর কাজের নাম উল্লেখ করতে হবে না। আমার কথা হচ্ছে কি জানো— কাজের সময় সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করা যায়, তা বলে এইসব আমোদ-প্রমোদ নয়।"

বিমর্ষ হইয়া দেবু বলিল, "পিক্‌নিকটাকে তুমি কেবল আমোদ-প্রমোদই বল কৃষ্ণাদি'! ওতে কত জ্ঞান অর্জ্জন করা যায়, কত নূতন জিনিষ দেখা যায়—"

কৃষ্ণা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সহাস্যে বলিল, "অমনি দুঃখু হয়ে গেল? আচ্ছা, চল মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করা যাক্। যদি তিনি বলেন, তাহলে না হয় যাব তোমার সঙ্গে—"

—"সত্যি?"

দেবু আনন্দে লাফাইয়া উঠিল।

গ্রহের ফের—

কৃষ্ণা দুই হাতে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল।

[পৃঃ—৯৫

দুই

কৃষ্ণার যাওয়া হইল না।

মিসেস্ মিত্র মত দিলেন না, কাজেই দেবুকে একাই যাইতে হইল।

কৃষ্ণার সহিত কথা রহিল, রাত্রে কৃষ্ণা তাহার গল্প বিস্তৃত-ভাবে শুনাইবে। দেবুর বন্ধুরা এখন তাড়াতাড়ি বলিয়া কিছু শুনিতে পাইল না, পিক্‌নিক্ সারিয়া রাত্রে তাহারা এখানে আসিবে।

মিসেস্ মিত্র বলিলেন, "এখানে তোমায় ওরা এতটুকু পড়ার সময় দেবে না কৃষ্ণা! যে রকম ব্যাপার দেখছি, তাতে কোন্‌দিন দেখব স্কুলশুদ্ধ ছেলে তোমায় ঘিরে ফেলবে!"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "আমি তো এখানে পড়তে আসিনি মাসীমা,—এসেছি বেড়াতে, গল্প করতে। দেবুকে আমার খুব ভালো লাগে মাসীমা, ভারী ভালো ছেলে। পড়াশুনায় ও বেশ ভালো। দেখলুম, অনেক বাইরের জ্ঞানও আছে।"

মিসেস্ মিত্র বলিলেন, "ওর বাবা ওকে কেবল পড়ার বই পড়ান না, তাঁর কাছে বাইরের বই পড়ে গল্প করতে হয়, আলোচনা করতে হয়। সেইজন্যেই ওর বাইরের জ্ঞান হয়েছে মা! নইলে কেবল পড়ার বইয়ের মধ্যেই ওর জ্ঞান থাকতো।"

বাহিরে তখন বিপুল আয়োজন চলিতেছিল। পিক্‌নিকের আয়োজন করা হইয়াছে সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে, ইছামতী নদীর তীরে একটা বাগানের মধ্যে। ছেলেরা একদিন মাষ্টার-মহাশয়ের সহিত এদিকে বেড়াইতে আসিয়া ভবিষ্যৎ পিক্‌নিকের জন্য এই জায়গাটি ঠিক করিয়া গিয়াছিল। একখানা লরী ও তিনখানা মোটর ঠিক করা হইয়াছে। হাকিম-সাহেবের বাড়ী হইতে সবগুলি ভর্ত্তি হইয়া ছাড়িবে, ঠিক করা আছে। সেই কথা অনুসারে ভোর হইতে হইতে ছেলেরা আসিয়া জুটিয়াছে, লরী এবং মোটর-গাড়ীগুলিও আসিয়াছে। লরীতে করিয়া জিনিষপত্র, দুইজন ভৃত্য, কয়েকটি ছেলে ও একজন শিক্ষক আগে রওনা হইলেন। বাকি তিনখানা মোটর পূর্ণ করিয়া ছেলেদের লইয়া শিক্ষকেরা অগ্রসর হইলেন।

দেবুর জীবনে এই প্রথম গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করা, আনন্দ ও উৎসাহের তাহার শেষ ছিল না। ছোটবেলা হইতে সে তাহার স্বাস্থ্যহীনতার জন্য মাসীমার নিকটে দিল্লীতে ছিল, মাত্র বছরখানেক কলিকাতায় আসিয়াছিল, এবং সেখান হইতে এখানে আসিয়াছে মাত্র পাঁচ মাস!

এই পাঁচ মাস এখানে সে স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহার বেড়াইবার স্থান সীমানাবদ্ধ, চাপরাশির সহিত স্কুলে যায় ও আসে, বৈকালে চাপরাশির সহিত বেড়াইতে যায়। কোন সময়ে একা বাহির হইবার উপায় তাহার নাই।

মিঃ মিত্রের ভয় বড় কম নয়, অতি সামান্য কারণেও তিনি

অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠেন। দেবুর দিকে তাই তাঁহার সতর্ক-দৃষ্টি অত্যন্ত বেশী,—তাহাকে কোথাও ছাড়িয়া দিতে ভয় পান।

পিক্‌নিকের স্থানটি দেখিয়া দেবুর আনন্দ ধরিতেছিল না। একদিকে নদী বহিয়া চলিয়াছে,—তাহাতে কত মাছ লাফাইতেছে, জলের মধ্যে চিকমিক করিয়া বেড়াইতেছে! নদীর উপর দিয়া কত পাখী দেশ-দেশান্তরে উড়িয়া চলিয়াছে!

বাগানের খানিকটা স্থান পরিষ্কার করিয়া লইয়া সেখানে রন্ধনের আয়োজন করা হইল; শিক্ষকেরা ছেলেদের কাজ ভাগ করিয়া দিলেন, ছেলেরা মহানন্দে কাজে লাগিল।

কতকগুলি ছেলে কেবল হৈ-হৈ করিয়া বেড়াইতেছিল,—দেবু ছিল ইহাদের মধ্যে একজন। বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলেরা ইহাদের কাজে টানে নাই, তাহাদের ছুটি দেওয়ায় তাহারা মনের আনন্দে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

কয়েকটি ছেলে নদীতে স্নানার্থে নামিয়া সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। দেবু নদীতে নামিল না, সে সাঁতার জানিত না,—সেইজন্য নদীর তীরে তীরে সে বেড়াইতে লাগিল।

আহারাদি দুপুরের মধ্যে মিটিয়া গেল,—ছেলেরা তখন ভ্রমণে বহির্গত হইল।

দলছাড়া হইয়া পড়িল দেবু।

ইচ্ছা করিয়াই সে দলের সহিত মিশিল না, একা সে নদীর তীরে বেড়াইতে লাগিল, তাহার সঙ্গীরা গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

দেবুর নদী বড় ভালো লাগে। জল কেমন সাঁ-সাঁ করিয়া চলিয়া যায়, নৌকাগুলা কেমন দুলিতে দুলিতে চলে! দেবুর এসব দেখিতে বড় ভালো লাগে।

নদীর ধারে একখানা বজরা নোঙর করা। এই বজরার সুন্দর সবুজ রংটি দেবুর চিত্তাকর্ষণ করিল। প্রথম দর্শনেই বুঝা যায়, এই বজরাটি সাধারণ বজরা হইতে পৃথক, অন্ততঃপক্ষে অনভিজ্ঞ দেবুর ধারণা তাই। বজরাটিতে যে কামরা ছিল, তাহার সার্সি-খড়খড়িগুলা খোলা ছিল। তীর হইতে দেবু দেখিল, কামরাটি বেশ সুসজ্জিত,—তাহাতে লোকজন আছে মনে হইল।

যে সরু পথটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া ইছামতী নদীর জলগর্ভে নামিয়াছে, দেবু সেই পথের উপর দাঁড়াইয়া পড়িল—বজরার নাম 'মোহিনী'।

—"কি খোকা, কি দেখছো?"

এই কর্কশ কণ্ঠস্বরে দেবু চমকাইয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইল। ঠিক তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া একটি লোক, মনে হয় গ্রামের পথে আসিয়াছে।

লোকটিকে দেখিয়া দেবু মোটেই খুসি হইতে পারিল না। লোকটির একটি চক্ষু নাই; সে চোখটা ঠেলিয়া বাহির হইয়াছে; কপালের মাঝখানে একটা আব আছে। মাথার চুল খুব ছোট করিয়া ছাঁটা, গায়ের রং নিকষ কালো; লম্বায় সে পূরা পাঁচ হাত, তেমনই চওড়া তাহার বুক, শক্তিশালী হাত-পা। তাহার

পরণে একটা সবুজ ডোরা লুঙ্গি, গায়ে একটা হাতকাটা বুক-খোলা বেনিয়ান।

দেবু নির্ব্বাক্‌ভাবে চাহিয়া আছে দেখিয়া লোকটা আরও একটু কাছে সরিয়া আসিল। দেবুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সে তাহার স্বাভাবিক কর্কশকণ্ঠে বলিল, "তোমাদের বাড়ী কি এই গাঁয়ে খোকা ?"

তাহার বার বার খোকা সম্বোধনে দেবু মনে মনে বেশ একটু গরম হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি পরম ধৈর্য্যের সঙ্গে সে বলিল, "আমার নাম খোকা নয়, আমি দেবী মিত্র, বসিরহাটের হাকিমের ছেলে।"

—"ও আপনি হাকিমের ছেলে ! সেলাম !"

লোকটা নত হইয়া একটা লম্বা সেলাম বাজাইল।

—"ছোট হুজুর, আমাদের বজরাখানা দেখছেন বুঝি ? আমি এই বজরার মাঝি, আমার নাম 'ইসমাইল—বজরা-খানা আমাদের জমিদারবাবুর—মানে টাকির বাবুদের। আপনি যদি দেখতে চান, ভালো করে দেখতে পারেন হুজুর !"

দেবুর কৌতূহল হইতেছিল কম নয়, তথাপি দুই-একবার ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "কিন্তু তোমাদের জমিদারবাবু—"

ইসমাইল আবার লম্বা এক সেলাম বাজাইল। বলিল, "তিনি এইখানে বজরা লাগিয়ে শিকার করতে গেছেন, ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। আপনি বজরা বেড়িয়ে যেতে পারেন

ততক্ষণ; কতক্ষণই বা লাগবে, না হয় আধ ঘণ্টাই লাগবে! তার বেশী তো নয়।"

—"আধ ঘণ্টা—"

দেবু একবার এদিকে, একবার ওদিকে চাহিল—ইছামতীর দুই তীর যেন ঘুমাইয়া আছে, জন-মানবের সাড়াশব্দ নাই, দুই-একটা গরু কেবলমাত্র চরিতেছিল।

সঙ্গীরা কতক্ষণে ফিরিবে, কে জানে? তাহাদের ফিরিয়া আসিতে আসিতে দেবুর বজরা দেখা শেষ হইয়া যাইবে। দেবু ভয় কাহাকে বলে জানে না; অন্য ছেলে হইলে হয়ত রাজী হইত না, কিন্তু সাহসী দেবু রাজি হইল; বলিল, "আধ ঘণ্টাই বা লাগবে কেন, পাঁচ মিনিটের দেখাতেই তো দেখা হয়ে যায়!"

ইসমাইল বিনীত কণ্ঠে বলিল, "পাঁচ মিনিট আর দশ মিনিট—দুটোর মধ্যে তফাৎও বা এমন কি আছে হুজুর? আচ্ছা, আসুন—"

সে অগ্রসর হইল, সঙ্গে সঙ্গে অদম্য কৌতূহলী দেবুও চলিল।

তিন

বজরায় দুইখানি ছোট কামরা—অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। ভিতরের কামরাটিতে একপাশে একখানা স্প্রিংয়ের খাট, পাশে একখানি ছোট টেবিল, তাহার সামনে একখানি স্প্রিংয়ের চেয়ার।

জন চার-পাঁচ মাল্লা বিশ্রাম করিতেছিল—ইসমাইল ও দেবুকে দেখিয়া তাহারা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

ইসমাইল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাদের পানে একবার তাকাইয়া দেবুকে সঙ্গে লইয়া প্রথম কামরাটিতে প্রবেশ করিল। এ কামরাটিও বেশ সুসজ্জিত ; দেখিয়া মনে হয়, এই কামরাটিতে আহারাদি-কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ভিতরের কামরাটিতে প্রবেশ করিয়া ইসমাইল বলিল, "বসুন হুজুর, এসেছেন যখন দু-পাঁচ মিনিট না বসে যাওয়া হবে না। আমার মনিব যখন ফিরবেন, এইসব মাল্লারাই বলবে আপনি এসেছিলেন ; তখন আপনাকে আমি খাতির করে বসাইনি জানলে তিনি আমায় তখনই জবাব দেবেন।"

অধৈর্য্য হইয়া দেবু বলিল, "আর বসতে হবে না—বসতে গেলে অনেক দেরী হয়ে যাবে। আমি বরং দাঁড়িয়েই সব দেখে নেমে যাই,—আমার সঙ্গীরা এখনই ফিরবে কিনা!

পাঁচটার সময় আমাদের এখান থেকে ষ্টার্ট করবার কথা।”

ইসমাইল বিনীত হাসি হাসিয়া বলিল, “এই সবে সাড়ে তিনটে বেজেছে হুজুর! আমি আপনাদের পিক্‌নিক্ করবার বাগান দেখে এসেছি, আপনাকে নিজে সঙ্গে করে ঠিক চারটার সময় ওখানে পৌঁছে দেব। আপনি ঐ চেয়ারে বসুন, আমি এক গ্লাস সরবৎ আপনাকে এনে দিই। এই দারুণ রোদে মানুষের জল-পিপাসা পায় বই কি!”

দেবু টেবিলের বইগুলো দেখিতে দেখিতে বলিল, “না, না, তোমায় আবার সরবৎ তৈরী করে আনতে হবে না। আমার মোটেই জল-পিপাসা পায়নি।”

ইসমাইল হাতযোড় করিল। বলিল, “তাও কি হয় হুজুর! আমার মনিব শুনতে পেলে তখনই আমায় জবাব দেবেন, সে কথাটা একবার ভাবুন।”

বেচারা মনিবের ভয়েই জড়োসড়ো!

এমন বিদ্‌ঘুটে চেহারার লোকটিকে জমিদারবাবুরা কেমন করিয়া পছন্দ করিলেন, খানিক আগেই দেবু এই কথা ভাবিয়াছিল। এখন তাহার মনে হইল,—না, লোকটার গুণ আছে; কেবল চেহারা দেখিয়া মানুষ বিচার করা ভুল।

ইসমাইল বলিল, “আপনি ততক্ষণ বইগুলো দেখুন হুজুর! ওগুলো আমাদের খোকাবাবুর বই। বাবু খোকাবাবুকে সঙ্গে করে এনেছেন কিনা, সবাই শিকার করতে গেছেন। এই

আপনারই মত খোকাবাবু। গুলি যা ছুঁড়তে পারেন, একেবারে অব্যর্থ লক্ষ্য ; এই কিছুদিন আগে আমাদের চাটগাঁয়ের জঙ্গলে একটা মস্তবড় বাঘ মেরেছেন।”

শুনিতে শুনিতে দেবু ম্লান হইয়া পড়ে।

খোকাবাবুর বাবা তাহাকে এই বয়স হইতেই কত বড় শিকারী করিয়া তুলিয়াছেন, আর তাহার বাবা তাহাকে কোণের মধ্যে সযত্নে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, বাহিরের মুক্ত আলো-বাতাসটুকু উপভোগ করিবার স্নুযোগটুকু পর্য্যন্ত দেন নাই।

মুখ তুলিয়া সে ইসমাইলকে দেখিতে পাইল না। সে বোধহয় সরবৎ আনিতে গিয়াছে।

বাংলায় ইংরাজীতে কয়েকখানা বই, সবগুলিতেই অ্যাড্-ভেঞ্চারের গল্প, বাঙ্গালী ও বিদেশী ছেলেদের অসীম শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয়।

কৃষ্ণাদি র জীবনটাও তো অ্যাডভেঞ্চারময়। মেয়ে হইয়া সে যতখানি শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছে, বাংলার কয়জন ছেলে তাহা পারে ?

—“হুজুর, সরবৎ !”

ইসমাইল সরবতের গ্লাসটা দেবুর সামনে টেবিলের উপর রাখিল। বলিল, “খেয়ে নিন্ হুজুর !”

সামনে সরবতের গ্লাস দেখিলে, তৃষ্ণা না থাকিলেও তৃষ্ণা জাগে। দেবু গ্লাসটা উঠাইয়া লইল ; জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাদের বাড়ী বুঝি চট্টগ্রামে ?”

ইসমাইল উত্তর দিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

গ্লাসে অল্প অল্প চুমুক দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দেবু বলিল, "ওখানে বুঝি খুব বন-জঙ্গল আর খুব বাঘ আছে?"

উৎসাহিত হইয়া ইসমাইল বলিল, "তা আছে বৈকি হুজুর! অনেক বন আর খুব বাঘ আছে। বড় হুজুর—মানে আপনার বাবা যদি কখনো ওদিকে বদলি হন, দেখতে পাবেন সে কি বন, আর সেই বনের মধ্যে কি বাঘের ডাক!"

গ্লাসটা শেষ করিয়া টেবিলে রাখিয়া, দেবু একটু নড়িয়া চড়িয়া ভালো হইয়া বসিল। বলিল, "বাঘ লোকালয়ে আসে?"

কল্পনায় সে দেখিতেছিল, পিতা চট্টগ্রামে বদলী হইয়াছেন, সেখানকার বাসার আশপাশে বাঘ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ইসমাইল মাথা কাত করিয়া বলিল, "তা আসে বৈকি হুজুর। দিনের বেলায় না এলেও রাত্রে ওদের গতিবিধি সর্ব্বত্র, তখন ওদের আটকাবে কে? আচ্ছা, আপনি একটু পড়ুন হুজুর, আমি মাল্লাদের একবার দেখে আসি। কোন ভয় নেই, আমি এখনই আপনাকে নিজে নিয়ে গিয়ে পৌছে দিয়ে আসব।

সে চলিয়া গেল।

দেবু দুই-একটা হাই তুলিতেছিল, কয়েকবার আড়মোড়া দিল। হঠাৎ কেমন যেন আলস্য বোধ হইতেছিল, মনে হইল, খানিকক্ষণ ঘুমাইয়া লয়! কোনদিন দিনের বেলা সে ঘুমায় না,

আজ শেষ রাত্রে উঠিয়াছে, সারাটা দিন ছুটাছুটি করিয়া এতটুকু বসিলেই ক্লান্তিভরে চোখ মুদিয়া আসা আশ্চর্য্যজনক নয়।

বইখানা টেবিলের উপর খোলা পড়িয়া রহিল। দেবু তাহারই উপর দিয়া দুটি হাত বিস্তৃত করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া এক মিনিটের মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

ইহারই একটু পরে দরজার উপর আসিয়া দাঁড়াইল, ইসমাইল।

দেবুর পানে তাকাইয়া তাহার বীভৎস মুখ আরও কুশ্রী কদাকার হইয়া উঠিল। দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া সে কড়মড় করিল।

তাহার পর কামরায় প্রবেশ করিয়া সে দেবুর পাশে দাঁড়াইয়া বার-দুই উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল—"হুজুর, হুজুর!"

হুজুরের সাড়া নাই, গভীর নিদ্রায় হুজুর মগ্ন, কানের কাছে ঢাক-ঢোল বাজাইলেও যেন তাহার ঘুম ভাঙ্গিবে না! ইসমাইল দুইবার ঠেলা দিল—দেবুর চৈতন্য নাই।

ক্ষুদ্র বালকের দেহটা অনায়াসে দুইহাতে তুলিয়া ইসমাইল স্প্রিংয়ের খাটে শোয়াইয়া দিয়া আলনা হইতে একখানা চাদর লইয়া পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত আগাগোড়া ঢাকিয়া দিল।

তাহার পর সন্তর্পণে জানালাগুলা বন্ধ করিল। একটিমাত্র দরজায় বাহির হইতে চাবি লাগাইয়া সে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

—"রহিম নোঙর তোলো।"

আকাশ তখন অকস্মাৎ ঘন কালো মেঘে ছাইয়া ফেলিয়াছে, সমস্ত পৃথিবীতে একটা থম্‌থমে ভাব, মনে হয় শীঘ্রই ঝড় আসিবে।

রহিম সেই কালো আকাশটার পানে একবার তাকাইল। ভয়ে-ভয়ে বলিল, "কিন্তু ঝড় আসবে যে কর্তা!"

ইসমাইল ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "যারা সমুদ্রে সাঁতার কাটে, ডিঙ্গি ভাসায় তালগাছের মত উঁচু ঢেউয়ের ওপর, এটুকু নদীতে এতটুকু মেঘ দেখে ঝড়ের ভয় তারা করে না রহিম! তুমি নোঙর তোলো।"

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রহিম ও অন্যান্য মাল্লারা নোঙর তুলিল।

সাঁ-সাঁ করিয়া বজরা ভাসিয়া চলিল।

চার

অন্ধকার ক্রমেই বাড়িতেছিল।

মিঃ মিত্র কোর্ট হইতে অনেকক্ষণ আগে ফিরিয়াছেন। সন্ধ্যা হইতে দেবুর ফিরিবার প্রত্যাশা করিতেছেন—দেবু ফিরিল না দেখিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা বাড়িয়া গেল।

কৃষ্ণা ও মিসেস্ মিত্র ভিতরের দিকে একটি ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, মিঃ মিত্র সেই ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন।

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি আগেই বারণ করেছিলুম ও-সব পিক্‌নিক্-টিক্‌নিকে দেবুর যোগ দিয়ে কাজ নেই। আমার কথা তো কানে নিলে না,—নিজে তাড়াতাড়ি মত দিয়ে বসলে। এখন এই যে রাত নয়টা বাজতে চললো, দেবু এখনও এলো না।"

বাধা দিয়া মিসেস্ মিত্র বলিলেন, "তোমার অস্থিরতা সবচেয়ে বেশী। দেবু তো একা যায়নি, অনেক ছেলেপুলে গেছে, চার-পাঁচজন টিচার সঙ্গে গেছেন—ভয়ের কারণটা ওঁখানে কি থাকতে পারে বল দেখি? সকলে যখন ফিরবে, দেবুও তখন ফিরবে; তার জন্যে ভাবনার কোন কারণ নেই।"

একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া মিঃ মিত্র বলিলেন, "ভয়ের

কারণ নেই তুমি তো বলছো, কিন্তু সেই পত্রখানার কথা ভুলে যাওনি বোধহয় ?”

মিসেস্ মিত্রের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া কৃষ্ণা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, “আপনি অমনি ভয় পেয়ে গেলেন মাসীমা! কিসের পত্র, কোথাকার পত্র, আমি তো কিছুই বুঝতে পারলুম না!”

মিসেস্ মিত্র শুষ্কমুখে একটু হাসিয়া কি বলিতে গেলেন, মিঃ মিত্র বাধা দিয়া বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, “চাপা দেওয়ার মত এতে কিছু নেই। যা সত্য, তা বরং কৃষ্ণাকে বলা যেতে পারে। কৃষ্ণার যা সাহস আর শক্তি আছে, তার এতটুকু তোমার তো নেই-ই, আমার পর্য্যন্ত নেই। ওর আর কতটুকু বা বয়স! এই বয়সেই কৃষ্ণা যা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে, তার এতটুকু আমাদের এদেশের মেয়েদের পর্য্যন্ত নেই। আমার মনে হয়, কৃষ্ণাকে সব কথা বলাই ভালো; আমার-তোমার চেয়ে ওর বুদ্ধি অনেকগুণ বেশী, ও সব বুঝবে।”

মিসে মিত্র ক্লিষ্টকণ্ঠে বলিলেন, “তুমি সব জানো—তুমিই বল।”

ব্যগ্র হইয়া কৃষ্ণা বলিল, “ব্যাপার কি মেসোমশাই?”

মিঃ মিত্র একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “ব্যাপার অত্যন্ত সাধারণ, একটা ডাকাতির মামলা মাত্র। ব্যাপার হলো এই—আমি যখন রংপুর জেলায় নীলফামারীতে ছিলুম, সেখানে একটা ডাকাতি কেসে দলপতি সমেত কুড়িজন ডাকাতের

বিচার করি। তাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই জাতই ছিল, আর দেশও সকলের ভিন্ন-ভিন্ন জেলায় ছিল। কেউ ছিল চব্বিশ পরগণার, কেউ চট্টগ্রামের, কেউ হুগলীর, কেউ মজঃফরপুরের, কেউ বা বালেশ্বর জেলার। দলটি বেশ নাম করে ফেলেছিল—লোকে বেশ চিনেছিল। দৈবক্রমে এদের মধ্যে একজন ধরা পড়ে, আর সেই-ই সব সন্ধান দেয়।"

কৌতূহলাক্রান্ত কৃষ্ণা হাতের বইখানা নামাইয়া মিঃ মিত্রের পানে চাহিল। বলিল, "তারপর কি হলো মেসোমশাই?"

মিঃ মিত্র বলিলেন, "তাদের সব জেলের হুকুম হয়। সেই দলের দলপতির নাম ছিল খাঁজাহান—অতি কুৎসিত চেহারার লোক। তাকে দেখেই মনে হতো, পৃথিবীতে হেন অপকর্ম্ম নেই, যা সে করতে পারে না। তার বাড়ী চট্টগ্রামে, কিন্তু কোন্ গ্রামে, কে জানে?

জেলে থাকতেই এই খাঁজাহান, যে লোকটা তাদের নাম প্রকাশ করে দিয়েছিল, হাতের একটা রডের আঘাতে তার মাথা ফাটিয়ে তাকে খুন করে। খুন করার অপরাধে তার তখন হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর?"

মিঃ মিত্র বলিলেন, "বিচারের সময় দণ্ডাদেশ পেয়ে সকল আসামী যেমন শাসায়, সেও আমায় তেমনি শাসিয়ে গিয়েছিল, কারণ আমি ছিলুম প্রধান সাক্ষী। সে বলেছিল, জেল হতে আগে সে ফিরে আসুক, তারপর আমায় দেখে নেবে। ভয়

পালানোর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না, সেই রকম সময়ে সে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে পালায়।"

কৃষ্ণার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। বিস্মিত কণ্ঠে সে বলিল, "কি ভয়ানক!"

মিঃ মিত্র বলিলেন, "কিন্তু ভুল করো না মা! ওরা সমুদ্র-তীরের অধিবাসী, সমুদ্রের ঢেউ দেখে ওরা ভয় পায় না, বরং সেই ঢেউয়ের মাথায় লাফ খায়। খাঁজাহানকে ধরবার জন্য গভর্ণমেণ্ট মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন, কিন্তু কেউ তার সন্ধান পায়নি।"

কৃষ্ণা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কবে সে তার প্রথম বিচারের সময় আপনাকে শাসিয়ে গিয়েছিল, সেই কথা ভেবে আপনি আজও ভয়ে-ভয়ে থাকেন মেসোমশাই?"

মিঃ মিত্র বলিলেন, "না, আজ মাত্র কয়েক মাস আগে এখানে আমার নামে সে একখানা পত্র দিয়েছে, সেই পত্রখানা পড়ে অবধি আমার মনে ভয় হয়েছে। তোমার মাসীমার কাছে সে-পত্র আছে, সেখানা বরং তুমি পড়ে দেখতে পারো কৃষ্ণা!"

স্ত্রীর পানে তাকাইয়া মিঃ মিত্র বলিলেন, "সে পত্রখানা কৃষ্ণাকে দাও, ও একবার দেখবে।"

মিসেস্ মিত্র উঠিয়া ড্রয়ার খুলিলেন।

মিঃ মিত্র চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া হতাশ-পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন,

"পত্রখানা পড়লেই তুমি বুঝতে পারবে—সে প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যে কি রকম ব্যগ্র হয়ে উঠেছে! তার ধারণা, যে লোকটা তাদের নাম প্রকাশ করেছে, আমি তাকে অনেক প্রলোভন দেখিয়েছি, নইলে সে কখনও নাম বলতো না। তার এতটা রাগ হওয়ার কারণ, তাকে যখন জেলে দেওয়া হয়, তখন তার ছেলের খুব অসুখ ছিল; দ্বীপান্তর যেতে সে সাঁতার দিয়ে পালিয়ে আসে ছেলের জন্যে; কিন্তু বাড়ী ফিরে দেখে, তার ছেলে নেই। তাই তার যত রাগ!"

এই সময় মিসেস্ মিত্র পত্রখানা আনিয়া দিলেন। মিঃ মিত্র কথা শেষ না করিয়াই তাড়াতাড়ি পত্র খুলিলেন।

—"এই দেখ কৃষ্ণা, তুমি পড়।"

কৃষ্ণা পত্রখানা পড়িল।

মহামান্য হাকিম সাহেব—

খবরের কাগজে দেখে থাকবে আমি জাহাজ হতে পালিয়েছি। দিনরাত এদিক-ওদিক ঘুরে অবশেষে তোমায় পত্র লিখছি—কেন জানো?

তোমার ওপর আমার মর্মান্তিক আক্রোশ। আর আক্রোশ ছিল যার ওপর, সেই হতভাগ্য নবীনের মাথা এক ডাণ্ডার আঘাতে চুরমার করে দিয়েছি। সে যদি প্রলোভনে ভুলে আমাদের নাম না করতো, আমি ধরা পড়তুম না, তোমার কাছে বিচার হতো না, আমার ছেলেও মরতো না।

রাগ সামলাতে পারিনি, তাই নবীনকে খুন করেছি। দ্বীপান্তর যাওয়ার পথে পালিয়ে আমার দেশে গিয়ে দেখলুম,

আমার একমাত্র ছেলে মারা গেছে ; আমার স্ত্রী তার শোকে আর আমার শাস্তির আদেশ শুনে আত্মহত্যা করেছে।

আমি একা বেঁচে আছি, আর আমার কেউ নেই। আমি খোদার নামে শপথ করেছি এর প্রতিশোধ নেব। জনাব হাকিম সাহেব, তোমার ছেলেকে আমি নেব, বুঝাব ছেলে হারালে বাপের কি যন্ত্রণা হয়!

তোমার কাছে প্রার্থনা করেছিলুম, আমায় সাত দিনের মত ছেড়ে দাও—আমি ছেলেকে একবার দেখে আসি। তুমি জানো না—খাঁজাহান ডাকাত, খুনী হতে পারে, সে মিথ্যাবাদী নয়, সে কথা দিয়ে কথা রাখে। আমায় যদি একটিবার দেখতে যেতে দিতে, আমার এতটুকু ক্ষোভ থাকতো না। সেদিন তুমি হেসেছিলে, বিদ্রূপ করেছিলে, বলেছিলে—আমার ছেলের মরাই ভালো ; সেও তো বড় হয়ে আবার ডাকাতি করবে!

তোমার বিদ্রূপ আমার বুকে বিঁধে আছে জনাব হাকিম সাহেব! আমি তোমায় দেখাব খাঁজাহান কথায় যা বলে, কাজেও তাই করে। তোমার নাম আছে, যশ আছে, টাকা আছে ; আমি তোমাদের কাছে ঘৃণিত দস্যু হলেও তোমাদের সব থেকেও যে কিছু নেই, তাই প্রমাণ করব।

খাঁজাহান

কৃষ্ণা যখন মুখ তুলিল তখন মিঃ মিত্র হাতখানা আড়াআড়ি ভাবে চোখের উপর রাখিয়াছেন, মিসেস্ মিত্র ঊর্দ্ধপানে তাকাইয়া আছেন।

পত্রখানা ভাঁজ করিয়া খামের মধ্যে পূরিতে-পূরিতে

কৃষ্ণা বলিল, "এ পত্র দেখছি কয়েকমাস আগেকার লেখা। এ পত্র কয়মাস আগে পেয়ে আজ তার জন্যে ভীত হলে চলে না মেসোমশাই! আপনার দেবু যে রকম সুরক্ষিতভাবে গেছে, তাতে সহজে কেউ তার এতটুকু অনিষ্ট করতে পারবে না। পাঁচজন শিক্ষক, অতগুলি ছেলে; তা ছাড়া কয়েকজন চাকর, ড্রাইভারও রয়েছে; একা তো সে যায়নি।"

মিঃ মিত্র একটু যেন ভরসা পাইলেন, বলিলেন, "তাই হোক মা, তোমার কথাই সত্য হোক, দেবু ফিরে আসুক। আর কোন দিন ওকে আমি কোথাও পাঠাব না—"

স্ত্রীর পানে তাকাইয়া বলিলেন, "তুমিও আর কোন দিন ওকে কোথাও পাঠানোর প্রস্তাব করো না, বলে রাখছি।"

তিনি উঠিলেন।

পাঁচ

দ্বারোয়ান আসিয়া জানাইল, স্কুলের এক বাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন, সঙ্গে আছে তিন-চারটি ছেলে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের একজন শিক্ষক ও কয়েকটি ছেলে প্রবেশ করিল।

বিবর্ণ মুখে মিঃ মিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবু কই?"

শিক্ষক হেমবাবু উৎকন্ঠিত কণ্ঠে বলিলেন, "সে বাড়ী আসে নি? আমরাও যে তাই জানতে এলুম!"

মিঃ মিত্র নির্ব্বাকে কেবল হেমবাবুর পানে তাকাইয়া রহিলেন, একটি কথাও তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

কৃষ্ণা নিকটে একখানা চেয়ারে বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি বসুন, ছেলেরাও বসুক, অমন হাঁফাতে হাঁফাতে দাঁড়িয়ে কোন কথা হয় না।"

—"আর কথা! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, কৃষ্ণা—"

মিঃ মিত্র সামনের টেবিলটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণা ধমকের সুরে বলিল, "আপনি অমন অস্থির হবেন না মেসোমশাই! কোথায় কি হলো না হলো তার ঠিক নেই, আগে হতে একেবারে মুসড়ে পড়ছেন! আপনি বসুন, আগে সব কথা শোনা যাক।"

শ্রান্ত হেমবাবু বসিয়া পড়িলেন, ছেলে তিনটিও বসিল। নিজের চেয়ারখানা সরাইয়া তাঁহাদের কাছে বসিয়া কৃষ্ণা ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কখন্ ওখান হতে রওনা হয়েছেন ?"

প্রাচীন হেমবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "আমাদের ব্যবস্থা ছিল, ঠিক বেলা পাঁচটায় আমরা ওখান হতে রওনা হব, আধ ঘণ্টার মধ্যে এখানে পৌঁছে যাব ; কিন্তু—"

কৃষ্ণা বলিল, "সব ছেলে ঠিক মত হাজির হলো—কেবল দেবুকে পাননি—না ?"

হেমবাবু নির্ব্বাকে মাথা কাত করিয়া জানাইলেন, তাহার কথাই সত্য।

মিঃ মিত্র মুখ তুলিলেন, বলিলেন, "আর ও সব কথা—"

কৃষ্ণা হাত তুলিল, "আঃ, চুপ করুন না মেশোমশাই ! নিজে যখন কিছুই পারবেন না, অন্যের কাজে বাধা দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই আপনার। আপনি একজন তৃতীয় লোকের মত নির্ব্বাক হয়ে থাকুন। আমায় যদি আপনার বিশ্বাস হয়, উপস্থিতকার মত আমার হাতে ভার দেন দেখি।"

—"আর উপস্থিত—"

মিঃ মিত্র অতি করুণভাবে হাসিলেন।

কৃষ্ণা হেমবাবুর পানে চাহিল, বলিল, "মেশোমশাইয়ের এখন মাথার ঠিক নাই, আপনি আমাকেই সব কথা বলতে

পারেন। আপনি বোধহয় দেবুর কাছে আমার নাম শুনেছেন, আমার নাম কৃষ্ণা—কৃষ্ণা চৌধুরী—"

শুধু হাসির রেখা ওষ্ঠে ফুটাইয়া হেমবাবু বলিলেন, "দেবুর কাছে শুধু কেন মা, খবরের কাগজে কিছুদিন আগে তোমার ফটো দেখেছি, তোমার কথা পড়েছি। হ্যাঁ, তুমি কি জিজ্ঞাসা করবে কর, আমি আর এই সব ছেলেরা যে যা জানি, বলব।"

কৃষ্ণা বলিল,"আপনাদের ওখানে খাওয়া-দাওয়া হলো কখন—কখন পৌছালেন, ছেলেরা কি করছিল—এই সব কথাগুলো আমি শুনতে চাই।"

হেমবাবু বলিলেন, "আমরা এক ঘণ্টার মধ্যেই গিয়ে পৌঁছাই। জায়গাটা ইছামতী নদীর ধারে-—"

মিঃ মিত্র একটা আর্ত্তনাদ করিলেন, "সর্ব্বনাশ! দেবু নদীতে পড়ে যায়নি তো? ওদিকে নদী যা চওড়া, আর ও নদীতে যা হাঙর! মাঝে মাঝে কুমীরও দেখা যায়—"

হেমবাবু বলিলেন, "না, বাগানটা নদীর পাশে হলেও ছেলেদের ওপরে সর্ব্বদা আমাদের দৃষ্টি ছিল। কয়েকজন ছেলে নদীতে নেমে সাঁতার কেটেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে দেবু ছিল না। সে জলকে ভয়ানক ভয় করে দেখলুম, জল হতে অনেক তফাতে সে ছিল।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মিঃ মিত্র বলিলেন, "জন্মে পর্য্যন্ত তার স্বাস্থ্য খারাপ থাকার জন্যে মাসীর কাছে ছিল কিনা,

তার মাসী তাকে কোথাও যেতে দিত না—তাই সে জলও বড় একটা দেখেনি—"

কৃষ্ণা সে কথায় কর্ণপাত করিল না, হেমবাবুর পানে তাকাইয়া বলিল, "যতক্ষণ রান্না-বান্না হচ্ছিল, দেবু ওখানেই ছিল ?"

হেমবাবু ছেলে তিনটিকে দেখাইয়া বলিলেন, "দেবু এদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে ততক্ষণ কাটিয়েছে। রান্না হয়ে গেলে ছেলেদের আগেই দিয়ে দেওয়া হয়, ওরা খেয়ে নিয়ে গ্রাম বেড়ানোর কথা বলে। আমি ওদের মধ্যে দশ-পনেরো জন ছেলেকে নিয়ে গ্রামের দিকে যাই, আমাদের সঙ্গে দেবুও ছিল। অনেক দূর গিয়ে খেয়াল হলো দেবু আসেনি। একটি ছেলে বললে, সে আসতে আসতে ফিরে গেছে ; বলেছে গ্রামে গিয়ে কি দেখবে, তার চেয়ে নদী দেখতে ভালো।"

মিঃ মিত্র মাথায় হাত বুলাইলেন—

কৃষ্ণা বলিল, "এই ছেলেরা কিছু জানে—যারা আপনার সঙ্গে এসেছে ?"

হেমবাবু বলিলেন, "এরা জানে বলেই এসেছে। নরেন, তোমার সঙ্গে দেবু কি বলে গেছে এঁকে বল দেখি।"

দেবুর চেয়ে ছেলেটি দুই এক বৎসরের বড় হইবে,—সে বলিল, "দেবু গ্রামে না গিয়ে সেইখানেই দাঁড়ালো। নদীর তীরে একখানা খুব সুন্দর বজরা নোঙর করা ছিল, সে সেইখানা দেখছিল দেখতে পেলুম।"

—"বজরা—সুন্দর বজরা!"

কৃষ্ণা বিস্মিত হইয়া নরেনের পানে তাকাইল।

উৎসাহিত নরেন বলিল, "ভারি চমৎকার দেখতে। সবুজ রঙের বজরা, জানলা-দরজা সব সাদা,—দেখলে চোখ ফিরানো যায় না।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "বজরায় লোকজন ছিল?"

নরেন মনে করিয়া বলিল, "ভেতরে কেউ ছিল কিনা দেখতে পাইনি, তবে বাইরের দিকে দু-চার জন লোক বসে গল্প করছিল দেখেছি।"

পাশের ছেলেটি বলিল, "আমি আর একজন বিশ্রী চেহারার লোককে দেখেছিলুম। সে যা ভীষণ চেহারা, লম্বা ঠিক তাল-গাছের মত, তেমনি কালো তার গায়ের রং, দাঁতগুলো এত বড় বড় আর বার হয়ে রয়েছে—আমি একবার তার দিকে চেয়েই ছুটে পালিয়েছি, আর তার পানে ফিরেও চাইনি।"

মিঃ মিত্র সচকিত হইয়া উঠিলেন,—"বিশ্রী চেহারা? বলতে পারো খোকা—তার একটা চোখে ঢেলা বার করা অর্থাৎ ঠেলে বার হয়েছে কিনা, আর কপালে একটা আব আছে কিনা?"

ছেলেটি কুণ্ঠিত হইয়া আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "তা তো আমি দেখিনি। আমি একবার মাত্র তার পানে চেয়েই ছুট দিয়েছি। পেছনে সে আমায় ডাকছিল—বিশ্রী কর্কশ তার গলার স্বর, আমি তবু ফিরে চাইনি। এই মহিমের

সঙ্গে নাকি তার কথাবার্ত্তাও হয়েছিল, মহিমকে জিজ্ঞাসা করুন।"

মহিম ছেলেটি মাথা চুলকাইয়া বলিল, "হ্যাঁ—আমি খাওয়া-দাওয়ার আগে একাই বজরাটার কাছে গিয়েছিলুম। তখন সেই লম্বা লোকটা আমায় কাছে ডাকলে; যদিও ভয় হচ্ছিল, তবু সাহস করে তার কাছে গেলুম; সে আমায় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমরা কয়জন এসেছি, কয়জন টিচার সঙ্গে এসেছেন, কখন ফিরব, সব কথা সে জিজ্ঞাসা করলে; আমিও সাহসে ভর করে সব বললুম।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের সকলের নাম, বাপের নাম সব জিজ্ঞাসা করেছিল ?"

মহিম উত্তর দিল, "হ্যাঁ—সব—"

কৃষ্ণা বলিল, "দেবুর কথাও হয়েছিল ?"

মহিম বলিল, "হ্যাঁ, সব হয়েছে। সে আবার দেখতে চাইলে কোন্‌টি হাকিমের ছেলে!—তখন দেবু তীরে দাঁড়িয়ে ছেলেদের জলে সাঁতার কাটা দেখছিল, আমি তাকে দেখিয়ে দিলুম—"

আর্দ্র কণ্ঠে মিঃ মিত্র বলিলেন, "আর দেখতে হবে না কৃষ্ণা, দেবু খাঁজাহানের হাতে পড়েছে। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সে আমার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আজ সুযোগ আর সুবিধা পেয়ে সে দেবুকে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।"

কৃষ্ণা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "তাই বলে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে

কান্নাকাটি তো উচিত নয় মেসোমশাই! যা হোক একটা কিছু করতে হবে তো? বেশ বোঝা যাচ্ছে সে আগেই দেবুর পরিচয় নিয়েছিল, তারপর যে কোন রকমে ভুলিয়েই হোক বা জোর করেই হোক, তাকে বজরায় তুলে নিয়ে গেছে। আচ্ছা মহিম ভাই, তোমরা যখন গ্রাম দেখে ফিরেছিলে, বজরাখানা তখনও সেখানে ছিল?”

মহিম মাথা নাড়িল, “না, সেখানে বজরা ছিল না।”

—“হুঁ” বলিয়া কৃষ্ণা কি ভাবিতে লাগিল।

মিঃ মিত্র বলিলেন, “আচ্ছা, যে লোকটার সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিল, তার চেহারাখানা কি রকম বল দেখি?”

মহিম আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, বলিল, “আমি অমন বিশ্রী চেহারা কখনও দেখি নি স্যার! কপালে একটা আব্, একটা চোখ ঠেলে বার হয়েছে। যেমন বিশ্রী কালো রং, তেমনি লম্বা-চওড়া—”

“কৃষ্ণা, আর রক্ষা নেই!—দেবু খাঁ জাহানের হাতে গিয়ে পড়েছে! খাঁজাহানের ধারণা, তার ছেলে আমার জন্যেই মরেছে,—তার পত্রের ভাবে তাই বুঝায়। সে আমায় অমনি নিষ্কৃতি দেবে না কৃষ্ণা, আমার ওপর দিয়ে সে মর্ম্মান্তিক প্রতিশোধ নেবে—”

মিঃ মিত্র উঠিয়া, দাঁড়াইলেন, হাত দুখানা আড়াআড়ি ভাবে বুকের উপর রাখিয়া তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ছয়

পুলিশে খবর দেওয়া হইল, পুলিশ-এন্‌কোয়ারী সুরু হইল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কৃষ্ণা বলিল, "আপনার পুলিশ ওই মোটা-মুটি তদন্ত করবে মেসোমশাই, যেমন সাধারণতঃ হয়ে থাকে। খবরের কাগজে দেখেছেন তো ? প্রায়ই লোকের ছেলে-হারাণোর খবর পাওয়া যায়। সে সব জায়গাতেও তো পুলিশ-এন্‌কোয়ারী চলে, তবে সে সব ছেলেদের পাওয়া যায় না কেন ভাবুন।"

মিসেস্ মিত্র ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "এসব ছেলেদের নিয়ে তারা কি করে ?"

কৃষ্ণা বলিল, "কলকাতায় ব্যোমকেশবাবুকে চেনেন তো মাসীমা—যিনি আমাদের তদন্তের ভার নিয়েছিলেন ? কেবল আমাদের কেন, অনেক লোকের অনেক কিছু তদন্ত তিনি করে থাকেন। তাঁর কাছে আমি শুনেছিলুম, একদল লোক আছে যারা এমনই সব ছেলেদের দিয়ে ভিক্ষা করায়, দরকার বোধে তাদের অন্ধ করে, খোঁড়া করে, আবার সময় সময় বোবাও করে দেয়।"

—"উঃ !" মিসেস্ মিত্র অৰ্দ্ধ-চেতনাহীনভাবে চেয়ারে হেলিয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণা তাঁহার গায়ে হাতখানা রাখিয়া বলিল, "কিন্তু এই

৩

কথাটি শুনেই তো ভয় পেলে চলবে না মাসীমা! বরং এই সব বাইরের বিষয়ও ভাবুন। ভাবুন, এমনি করে কত ছেলেমেয়ে আমাদের চলে যাচ্ছে—হারিয়ে যাচ্ছে!"

মিসেস্ মিত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভগবান্ দেবুকে রক্ষা করুন।"

কৃষ্ণা বলিল, "কাকাবাবুর মুখে শুনেছি—একটা দল আছে যারা ছেলেদের চুরি করে দূরদেশে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তাদের চুরি-ডাকাতি করতে শিখায়। তাদের দেহই শুধু নয়, মনকে পর্য্যন্ত তারা এমন কলুষিত করে তোলে যা বলার নয়। কাকাবাবু এ সব দলকে চেনেন, তাঁকে একবার খবর দিলে ভালো হয়।"

মিসেস্ মিত্রের একান্ত জিদে মিঃ মিত্র কলিকাতার বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ ব্যোমকেশবাবুকে একখানা টেলিগ্রাফ করিয়া দিলেন,—"বিশেষ দরকার, এখনই আসা চাই।"

সেদিন কোর্টের বাহিরে আসিবামাত্র একটি জীর্ণবেশ ভিখারী মিঃ মিত্রের সামনে হাত পাতিল, করুণ সুরে বলিল, "দুদিন খেতে পাইনি সাহেব, একটা পয়সা।"

কোর্টের আরদালী, চাপরাশীগণ ছুটিয়া আসিল, হৈ-হৈ করিয়া তাহারা ভিখারীকে বাহির করিয়া দিল।

নিজের বাংলোর কাছে আসিয়া সেই ভিখারীকে সেখানে বারাণ্ডায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মিঃ মিত্র আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

ভিখারী হাত পাতিয়া বলিল, "কোর্টের সামনে হুজুরের আরদালী-চাপরাশীরা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে; বাধ্য হয়ে হুজুরের বাংলোয় এসেছি। যদি কিছু পাই, ভারি খুসি হয়ে খেয়ে বাঁচব।"

মিঃ মিত্র হুঙ্কার ছাড়িলেন, "রামসিং, তেগবাহাদুর, এই উস্‌কো জলদি নিকাল দেও।"

আদেশমাত্র ভোজপুরী রামসিং ও নেপালী তেগবাহাদুর আসিয়া ভিঁখারীকে চাপিয়া ধরিল।

সেই সময় বাহিরে গোলমাল শুনিয়া কৃষ্ণা আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল।

ভিখারী মৃদু মৃদু হাসিতেছে, বলিতেছে—"ধাক্কা দিচ্ছো কেন বাবা, একটু ভদ্রভাবেই না হয় নিয়ে চল—"

"অ্যাঁ, কাকাবাবু—আপনি!"

কৃষ্ণা দ্রুত নামিয়া আসিল—বলিল, "কি করছো তোমরা, এযে কাকাবাবু! কলকাতা হতে মেসোমশায়ের তার পেয়ে এসেছেন।"

সন্ত্রস্তে রামসিং ও তেগবাহাদুর তখনই সরিয়া দাঁড়াইল। মিঃ মিত্রের মুখে কেবল একটি মাত্র শব্দ উচ্চারিত হইল, "ব্যোমকেশবাবু!"

পর-মুহূর্ত্তে তিনি ভিখারী-বেশধারী ব্যোমকেশকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং সঙ্গে লইয়া গিয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন।

তিনি হাতযোড় করিয়া বলিলেন, "আমায় মাপ করুন ব্যোমকেশবাবু,—আপনি যে এমন ভিখারীর বেশ এখানে আসবেন, কোর্টের সামনে হাত পাতবেন, তা আমি মোটে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি!"

ব্যোমকেশবাবু বলিলেন, "এতে আপনার এতটা সঙ্কুচিত বা লজ্জিত হওয়ার কারণ নেই মিঃ মিত্র! আপনি যে আমায় চিনতে না পেরে অপমান করেছেন, সেটা আমার লজ্জা নয়, সেটাকে আমি অহঙ্কার বলে জানবো—আমার ছদ্মবেশের গর্ব্ব বলে মানব।"

মিঃ মিত্র বলিলেন, "বাস্তবিক আপনার ছদ্মবেশ অতি চমৎকার হয়েছে। কলকাতায় আপনাকে কতদিন দেখেছি, তবু আমি আপনাকে চিনতে পারলুম না! আচ্ছা, আপনি ও-পোষাক ছাড়ুন, চা খান, আমিও এ-পোষাক খুলে আসি।"

পোষাক খুলিয়া চা ও জল-খাবার খাইবার পর মিঃ মিত্র ব্যোমকেশকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিলেন, "আমায় একবার সেই জায়গাটা দেখতে হবে মিঃ মিত্র, যেখানে বজরা-খানা ছিল।"

কৃষ্ণা বলিল, "আজ রাত হয়ে এসেছে কাকা, কাল ভোরের দিকে যাওয়া যাবে। আমি ড্রাইভারকে বলে রেখেছি, ভোর হলেই চলে যাবেন। আমি মহিমকেও এই মাত্র খবর

কৃষ্ণা ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

[পৃঃ—৮৭

পাঠিয়েছি, কাল ভোরে সে আসবে, জায়গাটা সে দেখিয়ে দেবে।”

সে রাত্রিটা কোন রকমে কাটাইয়া ভোর হইলেই কৃষ্ণা ব্যোমকেশকে গিয়া ডাকিল, “উঠুন কাকাবাবু, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।”

মহিম ও কৃষ্ণাকে লইয়া ব্যোমকেশ মোটরে উঠিলেন।

যাইতে যাইতে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি সে লোকটাকে দেখেছো খোকা? কি রকম দেখতে বল তো?”

মহিমের মুখে লোকটির বর্ণনা শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণা বুঝিল, তিনি তাহাকে চিনিয়াছেন।

ব্যোমকেশ সোৎসাহে চীৎকার করিলেন, “আরে সে লোকটাকে আমি যে বেশ চিনি! একবার কেন, দু-তিনটা ডাকাতি কেসে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে যে!”

কৃষ্ণা বলিল, “তবে এবারেও তো আপনি অতি সহজে তাকে ধরতে পারবেন কাকাবাবু?”

“—সহজে?”

ব্যোমকেশ একটু হাসিলেন, বলিলেন, “নিতান্ত সহজে ধরা পড়ার পাত্র খাঁজাহান নয় কৃষ্ণা! ওকে ধরতে বড় বেগ পেতে হয়। মিঃ মিত্র তার বিচার করেছিলেন বটে, কিন্তু তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না। আমাদের সব খবর রাখতে হয় বলে আমরা সব জানি। সে লোকটা বড় সহজ

লোক নয়, অনেক কীর্ত্তি তার আছে, আমাদের পুলিশের লোক প্রত্যেকে তাকে চেনে।"

কৌতূহলী হইয়া কৃষ্ণা বলিল, "আপনি যা জানেন, তাই কিছু সংক্ষেপে বলুন কাকাবাবু, বুঝতে পারি লোকটা কি রকম!"

ব্যোমকেশ বলিলেন, "শোন বলছি। ওই খাঁজাহানের আসল বাড়ী কক্সবাজারে। বুঝতেই পারছো সমুদ্রতীরে যারা বাস করে, সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে পালানো তাদের পক্ষে কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। লোকটা ছোটবেলা হতে ভীষণ ডানপিটে ছিল। প্রমাণাভাবে অনেক খুনের ব্যাপার হতে সে নিষ্কৃতি পেয়েছে, কেবল জেল খেটেই খালাস। ওর একটা দল আছে যারা সর্ব্বাংশে ওকেই অনুকরণ করে চলে, সংখ্যায় প্রায় শ' দুই লোক হবে।"

কৃষ্ণা বলিল, "মস্ত বড় ডাকাতের দল!"

ব্যোমকেশ বলিলেন, "হ্যাঁ। এরা কেবল জলে নৌকাযোগে ডাকাতিই করে না, স্থলেও করে থাকে। আর কেবল চট্টগ্রাম অঞ্চলে এরা সীমাবদ্ধ নয়, সারা বাংলায় এদের দল চলাফেরা করে, সময় ও সুযোগ মত চুরি-ডাকাতি, খুনও করে থাকে।"

কৃষ্ণা বলিল, "এখানেও তো একটা ডাকাতি-মামলায় ধরা পড়েছিল শুনলুম। তারপর জেলে গিয়ে একটা খুন করে, সেই জন্যে তাকে জাহাজে করে দ্বীপান্তরে পাঠানো হচ্ছিল, আর সেই জাহাজ হতে—"

ব্যোমকেশ বাধা দিলেন, "সে পালিয়ে যায় জলে লাফ দিয়ে পড়ে। অসুখের ভাণ করে সে পড়ে থাকতো ; যা কিছু খেতো, সব বমি করে ফেলতো। অসুস্থ রোগীকে তেমনভাবে পাহারা দেওয়ার আবশ্যকতা প্রহরী বোধ করেনি, তাই সে পালাতে পেরেছিল। যাই হোক—সে এবার প্রতিহিংসা-ব্রত নিয়েছে দেখতে পাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যবসাও খুলেছে জানো কৃষ্ণা ?"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলে-চুরির ব্যবসা ?"

ব্যোমকেশ উত্তর দিলেন, "ঠিক তাই। এই সব ছেলেদের নিয়ে গিয়ে সে কোথায় রাখছে, সে সন্ধান আমরা আজও পাইনি, অথচ কর্ত্তৃপক্ষর কাছে ধমক খেতে-খেতে আমাদের প্রাণ গেল ! দেখি, যদি কোন রকমে সন্ধান পাই, তখন একবার ওই খাঁজাহানকে দেখে নেব।"

মোটর এই সময় থামিয়া গেল, ড্রাইভার দরজা খুলিয়া দিতে মহিম, কৃষ্ণা ও ব্যোমকেশ নামিয়া পড়িলেন।

সামনের নদীতীর নির্দ্দেশ করিয়া মহিম বলিল, "এই যে, এই জায়গায় বজরাটা নোঙর করা ছিল দেখুন।"

কৃষ্ণা বলিল, "দেখছেন কাকাবাবু, বজরা সহরের দিকে যায়নি। এইদিক বরাবর চলে গেছে যে দিক দিয়ে অন্য নদীর সহযোগিতায় সাগরের বুকে পড়তে পারে।"

ব্যোমকেশ চিন্তিত মুখে বলিলেন, "কিন্তু সাগরের বুকে বজরা বেয়ে চলা—"

কৃষ্ণা একটু হাসিয়া বলিল, "কক্সবাজারের লোকেরা খুব পারবে কাকাবাবু! এইতো আপনি বললেন তারা সমুদ্রকে ভয় করে না। সত্যি, যারা সাগরের বুকে ডিঙ্গি ভাসায়, তারা একটা বজরা ভাসিয়ে চলতে পারবে না?"

কাছাকাছি কোন লোককেই দেখা গেল না যাহাকে ব্যোমকেশবাবু দু-একটা প্রশ্ন করিতে পারেন।

বাধ্য হইয়া তিনি আবার মোটরে উঠিলেন।

সাত

মিসেস্ মিত্র বসিরহাটে থাকিতে আর রাজি নহেন, বাধ্য হইয়া মিঃ মিত্র তিন মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন।

কৃষ্ণাকে মিসেস্ মিত্র ছাড়িয়া দেন নাই,—পুত্রের শোকে তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্যোমকেশবাবু এখানকার তদন্ত শেষ করিয়া সেইদিনই কলিকাতায় চলিয়া গেছেন, তাহার আর কোন খোঁজ নাই।

কলিকাতায় ফিরিয়া নিজের বাড়ীতে আসিতে প্রণবেশের সঙ্গে দেখা হইল।

প্রণবেশ কৃষ্ণার আপাদ-মস্তক একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "এখনই চলে এলে যে কৃষ্ণা, একমাস ওখানে থাকবার কথা ছিল না ?"

কৃষ্ণা বলিল, "মাসীমা মেসোমশাই চলে এলেন কিনা, কাজেই বাধ্য হয়ে আমাকে অনেক আগেই চলে আসতে হলো মামা !"

প্রণবেশ ভালো করিয়া জাঁকিয়া বসিলেন—"হ্যাঁ, বল তো কৃষ্ণা, ওঁদের ব্যাপারখানা কি ? খবরের কাগজে দেখি, বড় বড় অক্ষরে লিখেছে এস-ডি-ও-র একমাত্র পুত্র অপহরণ। তার পরই দেখি, আমাদেরই মিঃ মিত্রের ছেলে দেবুকেই তারা

নিয়ে গেছে, কোথায় নাকি পিক্‌নিক্ করতে গেছল—সেখান হতে। সেদিন ব্যোমকেশবাবু নাকি তদন্তের ভার নিয়ে গিয়েছিলেন ; শুনলুম তুমিও নাকি ইচ্ছা করেছো এর তদন্ত করতে।”

কৃষ্ণা হাসিল। বলিল, “আমার ইচ্ছেটা তুমি এখানে এত দূরে থেকে কি করে জানতে পারলে মামা ?”

প্রণবেশ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “কালকের কাগজে দিয়েছে যে, তুমি দেখনি বুঝি ?”

তিনি টেবিলের উপরের সেদিনের সংবাদপত্রখানা খুলিয়া দেখাইলেন।

কৃষ্ণা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, সংবাদপত্রে স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে, “বিখ্যাত বার্ম্মিজ-দস্যু ইউউইনের চক্রান্ত যে মেয়েটির অসামান্য চাতুর্য্যের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই অসীম-সাহসিকা ও প্রখর বুদ্ধিশালিনী কুমারী কৃষ্ণা চৌধুরী এই তদন্তের ভার নিজের হাতে লইয়াছেন।”

কৃষ্ণা কাগজখানা সরাইয়া রাখিয়া বলিল, “অথচ ভার আমি নিইনি মামা, নেব ভেবেছি আর সেইজন্যে আমার এক বন্ধু চন্দ্রিকাকেও পত্র লিখেছি। তাদের বাড়ী চট্টগ্রামে, সেখানেই গিয়ে উঠব। যাবে মামা ? ওদিককার প্রাকৃতিক শোভা নাকি ভারি সুন্দর ! একদিকে চন্দ্রনাথ পাহাড়, অন্য দিকে সমুদ্র,—সেসব নাকি দেখবার মত জিনিস !”

প্রণবেশ ধীরে ধীরে মাথা দুলাইলেন। সন্দিগ্ধভাবে

বলিলেন, "একবার যা সমুদ্র দেখেছি বর্ম্মামুলুকে যেতে, আর দেখার ইচ্ছে নেই বাপু, সত্যি কথাই বলছি।"

বলিতে বলিতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

কৃষ্ণা বলিল, "এবার তো জাহাজে পাড়ি দিতে হবে না মামা! থাকবে তো চট্টগ্রামে একজনের বাড়ীতে, বড় জোর তীর হতে সমুদ্র দেখবে আর পাহাড়ে উঠবে—চন্দ্রনাথ দেখবে, এইমাত্র, আর তো কিছু নয়।"

প্রণবেশ তৎক্ষণাৎ রাজি।

সন্ধ্যার দিকে মিঃ মিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার মুখখানা বিবর্ণ মলিন।

একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হতাশাপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আবার একখানা লাল অক্ষরে লেখা পত্র পেয়েছি কৃষ্ণা! পুলিশের হাতে দেওয়ার আগে ব্যোমকেশবাবুর কাছে নিয়ে গেলুম; দেখলুম, তিনি বাড়ী নেই, কাল নাকি চট্টগ্রামে রওনা হয়েছেন। তোমাকে দেখাতে আনলুম পত্রখানা। একবার দেখে ঠিক কর দেখি, ওরা যে ভয় দেখাচ্ছে তা সত্য না মিথ্যা!"

পকেট হইতে একখানা কভারসুদ্ধ পত্র বাহির করিয়া তিনি কৃষ্ণার হাতে দিলেন।

তাড়াতাড়ি পত্রখানা খুলিয়া ফেলিয়া কৃষ্ণা পড়িল:

মহামান্য হাকিম সাহেব,

অকস্মাৎ কিছু টাকার দরকার হওয়ায় বাধ্য হয়ে তোমার ছেলেকে অপহরণ করতে হলো। ঠিক প্রতিহিংসাবশেও বটে,

নিজের টাকার দরকারেও বটে। কোথায় তাকে রেখেছি, তা বলব না—তবে মোটের ওপর জেনো, সে ভালোই আছে; খাওয়া, স্নান, ঘুম—তার বাড়ীর মতই চলছে। উপস্থিত তোমায় জানাচ্ছি—তার জীবনের ততক্ষণ পর্য্যন্ত আশঙ্কা নেই, যতক্ষণ বুঝছি তোমায় দিয়ে আমাদের দরকার মিটবে। আমার উপস্থিত দশ হাজার টাকার বড় দরকার, এই টাকাটা তোমার কাছে চাই। যদি পাই, তোমার ছেলেকে আমরা নিজেরা তোমার বাড়ীতে পৌছে দেব কথা দিচ্ছি, আর একথাও মনে রেখো, খাঁজাহান খোদার নাম করে যে শপথ করে, সে শপথ রাখে।

এই দশ হাজার টাকার কথা কাউকে না জানিয়ে কোন লোকের হাতে দিয়ে পাঠাবে। বাগবাজারের খালের ওধারে খানিকদূর সোজা গিয়ে দক্ষিণ দিকের একটা বস্তির—নং চিহ্নিত দরজায় আঘাত করলেই দরজা খুলে যাবে। সেই ঘরের মেঝেয় টাকা রেখে পিছন দিকে না চেয়ে বেরিয়ে আসবে। বার বার সাবধান করছি, সঙ্গে পুলিশ যেন না থাকে, আর টাকা রেখে আসবার সময় পিছন দিকে ফিরে চাইবে না।

আর এক কথা—সবগুলি যেন দশ টাকার নোট হয়, এমন কি একশো টাকার নোটও আমি চাইনে।

তোমার পুত্রের জীবনের বিনিময়ে দশ হাজার টাকা এমন কিছু বেশী নয়। আমি জানি—তোমার পিতৃ-সঞ্চিত, এমন কি নিজের উপার্জ্জিত অনেক দশ হাজার টাকা আছে, তা হতে একটা দশ হাজারের নোটের গোছা পুত্রের জন্য অনায়াসে ব্যয় করতে পারো। যদি না দাও, পুত্রের ছিন্নমুণ্ড সত্বরই উপহার পাবে।

আগামী শনিবার রাত্রি দশটা হতে এগারোটা পর্য্যন্ত টাকা পাঠানোর সময়, মনে থাকে যেন।

খাঁজাহান

কৃষ্ণা মুখ তুলিল।

উত্তেজিত প্রণবেশ বলিল, "ব্যোমকেশবাবু মিথ্যে চট্টগ্রামে গেছেন, খাঁজাহান তো এখানেই আছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।"

কৃষ্ণা বলিল, "যতদূর মনে হয়, খাঁজাহান গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। দেবুকে এখানে রাখেনি, তাকে চট্টগ্রামে তার নিভৃত জায়গায় রেখে ট্রেণে করে ফিরে আসা খাঁজাহান কেন, একজন সামান্য লোকের পক্ষেও কষ্টকর নয় মামা!"

প্রণবেশ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন, তাকে বুঝি এখানে কোথাও রাখতে পারে না? এই যে সেদিন ব্যোমকেশবাবু বড় বাজারের দিকে একটা বাড়ী হতে অমন দশজন ছেলেকে বার করলেন—"

কৃষ্ণা বলিল, "সেইজন্যেই ওরা সাবধান হয়েছে, জেনেছে এখানকার আড্ডার সন্ধান পুলিশ জেনেছে, তাই বাইরে কোথাও জায়গা করেছে। কাকাবাবু বিনা সন্ধানে চট্টগ্রামে যাননি—কোন খোঁজ পেয়ে চলে গেছেন কাউকে না জানিয়ে।"

প্রণবেশ বলিলেন, "ওটা ডাকাতদের মানুষের চোখে ধূলো দেওয়ার কৌশল মাত্র। আমি বলছি, দেবু এখনও এখানে আছে, এর পর তাকে সময় আর সুযোগ বুঝে ওরা সরাবে। ওরা বেশই জানে, ছেলে-চুরির সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশ ছুটেছে, সে

অবস্থায় চট্টগ্রামের মত দূর জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়।”

কৃষ্ণা চুপ করিয়া রহিল।

মামার কথাটা সত্য হইতেও পারে! এ-কথা সত্য, সেই নীল রংয়ের বজরায় করিয়া তাহারা যে দেবুকে লইয়া গেছে, পুলিশ এ-খোঁজ পাইয়া অনুসন্ধান করিবে এবং সে-মুহূর্তে ধরা পড়াও অসম্ভব নয়, বরং কিছুদিন কলিকাতার কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া গোলমালটা একটু থামিলে লইয়া যাওয়া সম্ভব।

মিঃ মিত্র বলিলেন, “ওসব তো পরের কথা, এখন আমি কি করব তাই বল। সামনে শনিবার, এই দিনে যদি টাকা না পাঠাই, তাহলে হয়তো তারা দেবুকে হত্যা করবে। খাঁজাহান সব পারে কৃষ্ণা, আমায় শাস্তি দিতে সে শিশুহত্যাও করতে পারে।”

কৃষ্ণা বলিল, “আজ আপনি বাড়ী যান মেসোমশাই, আমি ভেবে দেখি কি করা উচিত, তারপরে আমি আপনাকে গিয়ে জানাব।”

ব্যাকুলভাবে মিঃ মিত্র বলিলেন, “না দিলে যদি তারা দেবুকে হত্যা করে, আর তার ছিন্নমুণ্ড পাঠায়?”

সেই কল্পনা করিয়াই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

কৃষ্ণা শান্তকণ্ঠে বলিল, “আপনি আমায় ভার দিন মেসো-মশাই! আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, দেবুকে আমি ফিরিয়ে এনে দেব, জীবন্ত এনে দেব। আপনি আমায় এতটুকু বিশ্বাস

করুন দেখি! আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন আমার কথা রাখতে পারি।"

মিঃ মিত্র সজল চোখে বলিলেন, "কিন্তু তুমি মেয়েমানুষ মা!"

দৃঢ়কণ্ঠে কৃষ্ণা বলিল, "মেয়েরাও মানুষ মেসোমশাই! তারাও যে শিক্ষা পেলে ছেলেদের মতই কাজ করতে পারে, আমি শুধু সেইটাই দেখাতে চাই। চিরদিন মেয়েরা অন্ধকারে অনেক পিছনে পড়ে আছে; আমি তাদের জানাতে চাই, পিছনে নয়—সামনে এগিয়ে চলার দিন এসেছে, কাজ করার সময় এসেছে,—মেয়েরা এগিয়ে চলুক, তাদের শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিক্।"

আট

হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, দেবু উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু একি, তাহার পা বাঁধা রহিয়াছে যে! এমন করিয়া তাহাকে বাঁধিল কে?

সে একবার চীৎকার করিয়া ডাকিতে গেল—"মা!"

শুষ্ককণ্ঠে কোন ভাষা ফুটে না। পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া গেছে, একটু জল পাইলে সে বাঁচিয়া যায়, অনেকটা শক্তি ফিরিয়া পায়।

দেবু গোঁ-গোঁ করিতে লাগিল।

পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে প্রবেশ করিল একজন লোক, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তাহার কালো কাপড়ে আচ্ছাদিত। একবার দেবুর পানে তাকাইয়া সে পাশেই যে জলের কুঁজা ছিল তাহা হইতে গ্লাসে জল ঢালিয়া লইয়া দেবুর মুখে অল্পে অল্পে ঢালিয়া দিল। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় জলপান করিতে করিতে দেবুর মনে হইতেছিল—সে বাড়ীতেই আছে, মা তাহাকে জল খাওয়াইতেছেন।

জল খাইবার পর তাহার প্রকৃত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে ভালো করিয়া তাকাইল।

কালো পোষাক-পরা লোকটির পানে তাকাইয়া ভয়ে সে

আঁৎকাইয়া উঠে। বাঁধা হাত দুখানা এক করিয়া সে মুখের উপর চাপা দেয়।

লোকটা গ্লাস রাখিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল, দেবুও একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাত নামাইল।

প্রথমটায় তাহার মনে হইয়াছিল—সে স্বপ্ন দেখিতেছে! হাত তুলিতে গিয়া, পা নাড়িতে গিয়া বন্ধন অনুভব করিয়া সে বুঝিল, এ স্বপ্ন নয়, বাস্তবিক সত্য।

কেমন করিয়া সে এখানে আসিল—তাহাই সে ভাবিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ তাহার মনে পড়িল—সহর হইতে দূরে ইছামতীর তীরে সে পিক্‌নিক্ করিতে গিয়াছিল। একটা কুৎসিত লোক তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়া বজরায় তোলে, কি একটা সরবৎ খাইতে দেয়, তাহার পরই সে ঘুমাইয়া পড়ে। সে কি এখনও ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া এই সব অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতেছে?

মাথা ফিরাইয়া সে একবার স্থানটাকে দেখিয়া লইল। ছোট একখানা ঘর, মাটির দেয়াল, উপরে টালির ছাদ,—বাতাস চলাচলের জন্য উপরের দিকে একটু ফাঁক আছে; দেয়ালে একটি রুদ্ধ জানালা, রুদ্ধ একটি দরজাও আছে। এত অন্ধকার, সব-কিছুই অস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

এ নিশ্চয়ই স্বপ্ন! দেবুর জীবনে এতবড় ঘটনা সত্য হইবে কি করিয়া!

দেবু নড়াচড়া করিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মা—ওমা, একবার এসো এদিকে।"

সঙ্গে-সঙ্গে কালো পোষাক-পরা সেই লোকটি প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া দেবু এবার চোখ ঢাকিল না, বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল। লোকটিও তাহার পানে তাকাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, একটি কথাও উচ্চারণ করিল না।

সাহসে ভর করিয়া দেবু জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

সে উত্তর দিল না। এমনভাবে তাকাইয়া রহিল, যেন সে দেবুর প্রশ্ন শুনিতে পায় নাই।

দেবু আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

এবার সে লোকটি মুখ নাড়িল, অর্থাৎ সঙ্কেতে জানিতে চাহিল, "কি?"

বিরক্ত হইয়া দেবু চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমার নাম কি তাই জানতে চাচ্ছি।"

লোকটি কানে হাত দিল, মুখে হাত দিল, সঙ্কেতে জানাইল সে কানে শুনিতে পায় না, কথা বলিতেও পারে না।

দেবু ইসারায় তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিল। লোকটা যেমন আসিয়াছিল, তেমনই আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

এতক্ষণে দেবুর মনে হইল, সে বাড়ীতে নাই, সেই লম্বা লোকটা তাহাকে কোন উদ্দেশ্যে চুরি করিয়া আনিয়াছে। নিশ্চয়ই সরবতের সঙ্গে কোন ঔষধ মিশাইয়া তাহাকে

খাওয়াইয়াছিল, তাই সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এইবার তাহার নিজের বিপদ বুঝিবার জ্ঞান আসিল, সে বুঝিল ইহাদের নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে।

প্রথমটায় সে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, এতক্ষণে তাহার লুপ্ত-সাহস ফিরিয়া আসিল।

আস্তে আস্তে সে উঠিয়া বসিল।

হাত তাহার খোলা, কিন্তু পায়ে লোহার শিকল দিয়া বাঁধা, যেন সে উঠিয়া দাঁড়াইতে না পারে—কোনরকমে পলায়ন করিতে না পারে!

তথাপি দেবু বৃথাই সেই শিকল ধরিয়া টানাটানি করিল, কিছুতেই সে শিকল খুলিতে পারিল না। হায় রে, সে যদি স্যাণ্ডো কি ভীম ভবানী হইত! তাহা হইলে এ শিকল সে অনায়াসে ছিঁড়িয়া ফেলিত!

নিস্তব্ধে সে বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল কে জানে!

অকস্মাৎ দরজা খোলার শব্দে তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। দেখিল, সেই কালো লোকটা তাহার জন্য ভাত আনিয়াছে। জলের গ্লাস ও ভাতের থালা দেবুর সামনে নামাইয়া দিয়া ইঙ্গিতে সে খাইবার কথা জানাইয়া দিল।

দেবু ভাতের দিকে চাহিল না, যেমন বসিয়া ছিল, তেমনই বসিয়া রহিল।

—"উঁ—উঁ—"

লোকটা আঙ্গুল দিয়া ভাত দেখাইয়া একটা অস্পষ্ট শব্দ করিতেছিল, অর্থাৎ 'ভাত খাও, আমি থালা গ্লাস নিয়ে যাব।'

দারুণ ক্রোধে দেবু জলের গ্লাস ও ভাতের থালা দূরে টান মারিয়া ফেলিয়া দিল। ইসারায় জানাইল, সে কিছুই খাইবে না।

লোকটি নির্ব্বাকভাবে খানিকক্ষণ তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া থালা-গ্লাস কুড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। দরজাটা খোলা রহিল, ইচ্ছা করিয়াই সে দরজা দিল না।

পলাইবার এই সুযোগ।

দেবু হাত-পায়ে ভর দিয়া হামাগুড়ির মত দরজার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দরজার উপর দাঁড়াইল একজন লোক—তাহার পানে চাহিয়া দেবু মুখ ফিরাইল। এ সেই লোক—সেই কপালে আব, একটা চোখ নাই।

মিষ্টকণ্ঠে সে বলিল, "কি খোকা, খাবার দিলে সে খাবার অমন করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কেন?"

দেবু সবেগে মাথা নাড়িল, "না, আমি তোমাদের এখানে কিছু খাব না।"

লোকটি হাসিল, সে হাসিটাও অতি বিশ্রী! মনে হয়, সে দাঁত বাহির করিয়া ভয় দেখাইতেছে!

সে বলিল, "না খেয়ে ক'দিন থাকতে পারবে খোকা? ক্ষিধের চোটে বাঘে ধান খায় তাতো জানো?"

দেবু গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না ; একবার তাকাইয়াও দেখিল না।

লোকটি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "শোন খোকা, আমার কথামত কাজ না করলে আমি তোমায় ছেড়ে দেব না, তুমি তোমার বাপ-মাকেও আর দেখতে পাবে না। যদি আমার কথামত কাজ কর, শীগগিরই তোমায় আমি দিয়ে আসব কথা দিচ্ছি।"

বাপ-মায়ের কাছে দেবু যাইতে পারিবে—আনন্দ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে দেবু লোকটার বিকট মুখের পানে তাকাইয়া মুসড়াইয়া পড়িল।

লোকটি বাহিরের পানে তাকাইয়া ইঙ্গিত করিতেই সেই কালা-বোবা লোকটি নূতন থালা সাজাইয়া ও অন্য গ্লাসে জল আনিয়া দেবুর সামনে রাখিল। কেবল মুক্তি পাইবার আশায় দেবু খাইতে বসিল।

বিশ্রী লোকটি বলিল, "তুমি এখান হতে পালানোর চেষ্টা করলেও পালাতে পারবে না। এমন জায়গায় তোমায় রাখা হয়েছে, যেখান হতে হাজার চীৎকার করলেও বাইরের কেউ শুনতে পাবে না। যে লোক তোমায় দেখাশোনা করে, সে কালা-বোবা ; কাজেই তাকে কোন কথা বলাও তোমার ভুল হবে।

আমি আজ চলে যাচ্ছি, দু-চারদিন পরে ফিরে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তখন দেখব, যদি তুমি বেশ ভালো ছেলে

"চুপ্‌—আমি কৃষ্ণা দি'।"

পৃঃ—৯৭

হয়ে আমাদের কথামত কাজ করছো, তাহলে তোমায় ছেড়ে দিতেও পারি—অর্থাৎ এর মধ্যে যদি তোমার বাবা টাকাটাও পাঠান।”

দেবু শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল, “বাবা টাকা পাঠাবেন কেন ?”

লোকটি আবার হাসিল। বলিল, “তোমার মুক্তিপণ, কিন্তু ওসব কথা তুমি বুঝবে না খোকা। তোমায় কয়েকখানা বই পাঠিয়ে দেব এখন, তুমি বই পড়, খাও-দাও ঘুমাও— বুঝলে ?”

সে চলিয়া যাইতেছিল, দেবু চীৎকার করিল, “শোন, শোন, তোমার নামটা কি আমি ভুলে গেছি।”

সে উত্তর দিল, “আমার নাম খাঁজাহান—”

দেবু সন্দিগ্ধভাবে বলিল, “কিন্তু তুমি আমায় আগে এ-নাম তো বলনি—”

খাঁজাহান বলিল, “না, তখন অন্য নাম বলেছিলুম, এ-নাম বলার দরকার তখন হয়নি।”

সে ফিরিতে দেবু আবার চীৎকার করিল, “আর একটা কথা ! আমি কোথায় আছি সে-কথাটা আমায় বলে যাও, একি বসিরহাট না আর কোনও দেশ ?”

খাঁজাহান বলিল, “না, উপস্থিত তুমি কলকাতায় আছ, কয়েকদিন বাদে তোমায় অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে।”

খাঁজাহান বাহির হইবার সঙ্গে-সঙ্গে দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

দেবু কলিকাতায় আছে ?

কান পাতিয়া সে শুনিবার চেষ্টা করিল, মুখর কলিকাতার কোন শব্দ কানে আসে কিনা—নাঃ, সব নিস্তব্ধ !

দেবু ভাবিতে লাগিল পিতামাতার কথা, তাহার কৃষ্ণাদি'র কথা।

কৃষ্ণাদি' কতবড় ডিটেক্‌টিভের কাজ করিয়াছে, কিভাবে নিজেকে রক্ষা করিয়াছে, সে-সব গল্প সে শুনিয়াছে। নিশ্চয়ই কৃষ্ণাদি' এবারেও নিশ্চেষ্ট থাকিবে না, দেবুকে উদ্ধার করিবার ভার সে নিজেই গ্রহণ করিবে। একদিন হয়তো দেবু শুনিতে পাইবে, কৃষ্ণাদি' দরজার কাছে ডাকিতেছে, মুক্ত দ্বারপথে একদিন সে কৃষ্ণাদি'কে দেখিতে পাইবে !

দেবু সেই দিনটার কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

নয়

ব্যোমকেশ ফিরিয়াছেন।

শনিবার সকালে তিনি কৃষ্ণার সহিত দেখা করিতে আসিলেন।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কোনও সন্ধান মিললো কাকাবাবু?"

ব্যোমকেশ বলিলেন, "অনেক খোঁজ করলুম, জলপথ বা স্থলপথে বিশ্রী চেহারার কোন লোক কোন ছেলেকে নিয়ে ওখানে যায়নি। কক্সবাজারে খাঁজাহানের খোঁজ নিয়ে জানলুম, তাকে ওখানকার লোক আজ কয় বছর দেখেনি। পুলিশ অনুসন্ধান করছে, কিছু খবর পেলেই আমায় তার করবে।"

কৃষ্ণা বলিল, "মানুষ না হয় লুকাতে পারে, কিন্তু অতবড় বজরাখানা তো এই কয়দিনে লুকাতে পারে না কাকাবাবু! সে জিনিসটার কোনও খোঁজ পেলেন কি?"

ব্যোমকেশ অবহেলার সুরে বলিলেন, "মানুষই যদি না পাওয়া গেল, ফাঁকা বজরা নিয়ে আমার কি লাভ হবে বল।"

কৃষ্ণা বলিল, "সেটার সন্ধান পেলে মানুষের সন্ধান মিলতো।"

ব্যোমকেশ একটু হাসিলেন। বলিলেন, "কিছু করতে হবে না, আমি চারিদিকে খবর দিয়েছি, দেবুর ফটো আর খাঁজাহানের ফটো সব থানায় পাঠিয়েছি। সকলে জেনেছে, যে এদের ঠিক সন্ধান দিতে পারবে, সে পাঁচশো টাকা পুরস্কার পাবে। তুচ্ছ বজরার জন্যে মাথা খারাপ করে কোন লাভ নেই ; সেটা উপলক্ষ্য মাত্র, গেল বা থাকলো তাতে কি আসে যায় ?"

ঠিক এই সময়ে প্রণবেশ হাঁফাইতে হাঁফাইতে প্রবেশ করিলেন। ব্যোমকেশকে না দেখিয়া তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক তোমার কথামত একখানা বজরার সন্ধান মিলেছে কৃষ্ণা, ঠিক যেমন বলেছিলে তেমনি—"

বলিতে বলিতে ব্যোমকেশের পানে দৃষ্টি পড়িল। "এই যে ব্যোমকেশবাবু, নমস্কার!"

কথার সঙ্গে সঙ্গে শ্রান্তভাবে প্রণবেশ একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

একটু হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিলেন, "আপনাকে ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছে প্রণবেশবাবু! কোথায় যাওয়া হয়েছিল ? বজরার সন্ধানে ?"

একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া, হাই তুলিয়া প্রণবেশ বলিলেন, "যা বলেছেন! কাল রাত তখন এগারোটা হবে, পাগলী মেয়ে বজরাখানার কথা একজনের কাছে শুনেই লাফিয়ে উঠলো সেখানে যাওয়ার জন্যে! আরে মশাই, ছেলের মত

বুদ্ধি আর সাহস থাকলেও তুই মেয়ে—তোর কি ওই রাত্রে সেই বিদ্যাধরী নদীর ধারে একটা জংলা গ্রামে যাওয়া উচিত? ওকে বুঝিয়ে নিরস্ত করে সেই রাত্রে নিজেই গেলুম।”

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তারপর, দেখলেন বজরা?”

তাঁহার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ মিশ্রিত।

প্রণবেশ সোৎসাহে বলিলেন, “দেখলুম, তাতে উঠলুম, বেড়ালুম। আর সব ঠিক হলেও মূলে গরমিল হয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণা! আচ্ছা, তুমি চল, আমি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি, বেশীদূর নয়, মাইল কয়েক হবে, তুমি নিজের চোখে দেখে আসবে। আপনিও আসুন না ব্যোমকেশবাবু!”

অনিচ্ছার সঙ্গে ব্যোমকেশ বলিলেন, “আসল উদ্দেশ্য ছেড়ে মিথ্যে গিয়ে হয়রাণ হওয়া মাত্র। বলছেন যখন, চলুন যাচ্ছি; কিন্তু তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বজরা না হয় দেখলেন, উঠলেন, কিন্তু শুধু দেখলেই কি চোরের দল ধরা পড়বে, বলুন?”

কৃষ্ণা বলিল, “আপনার উত্তর আমি দিচ্ছি কাকাবাবু! অনেক সময় এতটুকু সূত্র ধরে অপরাধীর খোঁজ করা হয়, আর অপরাধী ধরাও পড়ে। ধোবার বাড়ীর চিহ্ন ধরে যদি বড় বড় চুরি-ডাকাতি খুনের কিনারা হয়, বজরা হতেও এই ছেলে-চুরির কিনারা হতে পারে।”

প্রণবেশ বলিলেন, “আমি আরও একটা কাজ করেছি কৃষ্ণা, আমাদের মহাদেও আমার সঙ্গে ওখানে গিয়েছিল তো!

তাকে ভোর হতে বসিরহাটের সেই ছেলেটিকে আনতে পাঠিয়েছি। বজরাটা সে বেশ চেনে, দেখলেই বুঝতে পারবে। আচ্ছা যাও, তুমি প্রস্তুত হয়ে এসো, আমি ততক্ষণ চা খেয়ে নিই।"

এই পাগলামী ব্যাপারের মধ্যে যোগ দিতে ব্যোমকেশের ইচ্ছা ছিল না, তবু বাধ্য হইয়া তাঁহাকে থাকিতে হইল।

অবিলম্বে কৃষ্ণা প্রস্তুত হইয়া আসিল এবং তিনজনে ট্যাক্সিতে উঠিলেন। প্রণবেশের নির্দ্দেশমত ট্যাক্সি চলিল।

প্রণবেশ বলিতে লাগিলেন, "তোমার মহিম ভাইটি এতক্ষণ বোধহয় এসে পৌঁছালো আর কি! সে এখানেই এসেছে কিনা! কাল তোমার সন্ধানে এখানে এসেছিল, তুমি বাড়ী ছিলে না, তাই দেখা হয়নি। সে বরানগরে তার মামার বাড়ী এসেছে, মহাদেও এতক্ষণ তাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে।"

দীর্ঘ পথ—হুস্-হুস্ শব্দে খোলা-পথে ট্যাক্সি ছুটিয়া চলিয়াছে।

দূরের বিদ্যাধরী নদী ক্রমশঃ নিকটে আসিল। জেলেরা নৌকায় থাকিয়া মাছ ধরিতেছে দেখা গেল। তীরের দিকে কয়েকখানা নৌকা বাঁধা আছে, সেইখানে একখানা বজরাও নোঙর করা আছে।

ট্যাক্সি থামিবার আগেই মহিমকে দেখা গেল—সে ট্যাক্সির নিকট ছুটিয়া আসিল।

কৃষ্ণা নামিল, প্রণবেশ ও ব্যোমকেশও নামিলেন।

প্রণবেশ বলিলেন, "এই সামনের বজরাখানা দেখ কৃষ্ণা,—মহিম, এই বজরাটাই তুমি দেখেছিলে না ?"

সাদা বজরার পানে তাকাইয়া মহিম হতাশভাবে বলিল, "এ বজরা নয় দিদি, সেখানা সবুজ রংয়ের ছিল ; জানলা-দরজা সাদা ছিল। এ বজরা সাদা রংয়ের, এর দরজা-জানলা সব সবুজ দেখছি।"

ব্যোমকেশ হাসিলেন। বলিলেন, "কেমন, আমি আগেই বলেছিলুম না—অনর্থক পণ্ডশ্রম !"

কৃষ্ণা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল। তাঁহার কথার উত্তরে কিছু না বলিয়া মহিমকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "রং ছাড়া আর কোন তফাৎ আছে কি ?"

মহিম ভালো করিয়া দেখিয়া বলিল, "না, এটা যদি সবুজ রংয়ের হতো তাহলে—"

কৃষ্ণা আগাইয়া গিয়াছে।

বজরায় মাঝি-মাল্লা কেহ নাই। একজন মাত্র লোক কেবিনের মধ্যে আগাগোড়া ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে। প্রণবেশের ধমকে সে মুখ খুলিয়া জানাইল—বজরার মাঝি-মাল্লা সব কোথায় গিয়াছে তাহা সে জানে না, তাহার ভয়ানক জ্বর, নড়িবার সম্ভাবনা নাই।

বাস্তবিকই তাহার জ্বর আসিয়াছে। প্রণবেশ তথাপি তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিল।

ওদিকে কৃষ্ণা ডাকিতেছে।

প্রণবেশকে পাশে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কৃষ্ণা মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা খুলিল। প্রণবেশ দেখিল, তাহার হাতে সাদা রং লাগিয়া আছে।

কৃষ্ণা বলিল, "আমার আগেই সন্দেহ হয়েছে মামা—এই বজরায় ঐ ছেলে নিয়ে খাঁজাহান এক কলকাতা ছাড়া আর কোথাও যেতে পারে না। বজরা এই পর্য্যন্ত এনে এখান হতে ট্যাক্সিতে করে দেবুকে সে কলকাতায় নিয়ে গেছে। বজরা পাছে ধরা পড়ে, তাই সঙ্গে-সঙ্গে বজরার রং পাল্‌টে দিয়েছে; সবুজ রংয়ের পরে সাদা রং লাগিয়েছে। দেখ, রং এখনও কাঁচা রয়েছে, হাত দিতেই উঠে গেছে, আর সেই জায়গায় সবুজ রং বার হয়ে পড়েছে।"

প্রণবেশ গম্ভীরভাবে পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর তীরে ব্যোমকেশের নিকটে ফিরিয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি কৃষ্ণার যুক্তি উড়িয়ে দিয়েছেন ব্যোমকেশবাবু! আপনি নিজে দেখতে পারেন এই বজরাটায় সবুজ রং ছিল, সম্প্রতি সাদা রং দেওয়া হয়েছে। হাত দিয়ে জোরে ঘষে দেখুন, সাদা রং উঠে গিয়ে সবুজ রং বার হয়ে পড়বে।"

ব্যোমকেশ পরীক্ষা করিলেন। কেবলমাত্র বলিলেন, "হুঁ!" আর একটি কথাও তাঁহার মুখে শুনা গেল না।

ফিরিবার সময় মহিমকেও এই ট্যাক্সিতে তুলিয়া লওয়া হইল। বরানগরে তাহার মামার বাড়ী তাহাকে নামাইয়া এবং ব্যোমকেশকে তাঁহার বাড়ীর সামনে নামাইয়া দিয়া, কৃষ্ণা

মাতুলসহ যখন নিজের বাড়ীতে ফিরিল, তখন বেলা প্রায় দুইটা বাজে।

একটু বিশ্রাম করিয়া স্নানান্তে আহারে বসিয়া কৃষ্ণা বলিল, "আমি একটা পথ দেখতে পেয়েছি মামা! কেবল তোমাকে আমি সাথে নেবো, আর ইন্‌স্পেক্টার মিঃ চ্যাটার্জ্জির সাহায্য নিতে হবে ”

ক্ষুধার্ত্ত প্রণবেশ ততক্ষণ কয়েক গ্রাস ভাত উদরস্থ করিয়াছেন, এক গ্লাস জল খাইয়া কতকটা সুস্থ হইয়া বলিলেন, "এইবার কথাবার্ত্তা বলা যেতে পারে, উদর-দেবতা কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। হ্যাঁ, কি বলছিলে? মিঃ চ্যাটার্জ্জির সাহায্য নেবে! কেন, আমাদের ব্যোমকেশবাবু—"

কৃষ্ণা বলিল, "কাকাবাবু বোঝেন একরকম, কাজ করেন অন্যরকম। ওঁর মনের ধারণা, উনি যা করবেন তাই নির্ভুল, অন্যে যা করবে সে সবই ভুল। আমি যে এতবড় একটা সূত্র এনে দিলুম, সেটাও উনি উড়িয়ে দিচ্ছেন। ওঁর পরে নির্ভর করে থাকলে শুধু হবে না মামা! এসো, আমরা দুই মামা-ভাগ্‌নীতে অন্যদিক দিয়ে কাজ করি। যেমন করেই হোক, দেবুকে ফিরিয়ে আনা কথা,—উনি ওঁর বুদ্ধি আর মত নিয়ে কাজ করুন, আমরা আমাদের বুদ্ধি আর মত নিয়ে কাজ করি।"

প্রণবেশ তৎক্ষণাৎ রাজি হইলেন। উপস্থিত ডিটেক্‌টিভ-গিরির ছোঁয়াচ তাঁহারও লাগিয়াছে,—এ-কাজে বিপদের আশঙ্কা থাকিলেও আনন্দ বড় কম নয়!

দশ

সেদিন শনিবার।

কৃষ্ণা প্রণবেশের সহিত মিঃ মিত্রের বাড়ী উপস্থিত হইল।

মিসেস্ মিত্র অসুস্থা,—তিনি উপরের ঘরে শুইয়া আছেন, একজন নার্স তাঁহার নিকটে রহিয়াছে। কৃষ্ণাকে দেখিয়া মিসেস্ মিত্র তাহার হাত দুখানা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "দেবুকে না এনে দিলে আমি বাঁচব না কৃষ্ণা! তুমি কতবার কত কাজ করেছো—ধরতে গেলে অসাধ্য-সাধন করেছো। আমাকে বাঁচাও, দেবুকে এনে দাও।"

কৃষ্ণা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কাঁদবেন না মাসীমা, আমি মেসোমশাইকে কথা দিয়েছি—দেবুকে যেখান হতে পারি, এনে আপনাদের দেবো। আপনি ভাববেন না, আমি সেইজন্যেই ঘুরছি।"

মিঃ মিত্রের সন্ধানে সে পাশের ঘরে গেল।

মিঃ মিত্র টেবিলের উপর নোটের তাড়া সাজাইয়া রাখিতেছেন। সবগুলিই দশ টাকার নোট। কৃষ্ণা দেখিয়া বুঝিল, দেবুর মুক্তিপণ হিসাবে এই দশ হাজার টাকা তিনি তাহারই কথামত গুছাইয়া রাখিতেছেন।

একটা ছোট স্যুটকেশে দশ হাজার টাকার নোট গণিয়া রাখিয়া কৃষ্ণা বলিল, "আপনি ভাববেন না মেসোমশাই, দেবুকে

খাঁজাহান উপস্থিত কলকাতাতেই রেখেছে, এইসব হাঙ্গামার জন্যে তাকে দূরে কোথাও নিয়ে যেতে পারেনি। যে বজরায় করে তাকে চুরি করে এনেছিল, কাল আমি সে বজরা দেখে এসেছি।"

—"সেই বজরা দেখেছো !"

মিঃ মিত্র প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

কৃষ্ণা বলিল, "হ্যাঁ, এখান হতে কয়েক মাইল দূরে বিদ্যাধরী নদীর তীরে সেই বজরা আছে, রংটা কেবল বদলেছে এইমাত্র। যাই হোক, আপনি কাল সকালে খোঁজ পাবেন আমরা কতদূর কি করতে পারলুম।"

মিঃ মিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যোমকেশবাবু তোমার সঙ্গে যাবেন না ?"

কৃষ্ণা বলিল, "আপনার এখানে আসার আগে তাঁর কাছে গিয়েছিলুম, শুনলুম তিনি আজ অন্য একটা ব্যাপারে ব্যস্ত ; কমিশনার কি কাজের জন্যে তাঁকে নাকি বর্দ্ধমানে পাঠাচ্ছেন !"

হতাশ হইয়া মিঃ মিত্র কপালে হাত দিলেন।

কৃষ্ণা আর অপেক্ষা করিল না, নীচে নামিয়া আসিল। প্রণবেশকে সে বৈঠকখানায় বসাইয়া উপরে গিয়াছিল, ফিরিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল না।

কৃষ্ণা মিনিট-পাঁচেক অপেক্ষা করিয়া আবার উপরের দিকে যাইবার জন্য ফিরিতেছিল, এমন সময় প্রণবেশ ফিরিয়া আসিল।

উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলিল, "একটা লোক বরাবর আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে এসেছে কৃষ্ণা! আমরা এ-বাড়ীতে ঢুকলেও সে লোকটা যায়নি, এ-পথে পায়চারী করে বেড়াচ্ছিল। আমি বাইরে বার হয়ে লোকটাকে লক্ষ্য করেছিলুম; কারণ আমরা যখন আসি, তখন আমাদের পিছনে-পিছনে সে আসছিল। তাকে এখানে পায়চারী করতে দেখে আমার সন্দেহ হলো। আমি খানিকক্ষণ ঘরে বসে জানলা দিয়ে দেখি, সে এই বাড়ীটার পানেই চেয়ে আছে। বার হয়ে যেমন তাকে জিজ্ঞাসা করেছি—তুমি এ বাড়ীটার দিকে লক্ষ্য করছ কেন, সে পাশের গলি দিয়ে ছুটে চলে গেল।"

কৃষ্ণা গম্ভীর হইয়া বলিল, "খাঁজাহানের লোক নাকি মামা?"

প্রণবেশ উত্তেজিত কণ্ঠেই বলিলেন, "নিশ্চয়।"

কৃষ্ণা চিন্তিত মুখে বলিল, "খাঁজাহানই ওকে পাহারায় রেখেছে। জানে—আজ টাকা দেওয়ার দিন, মিঃ মিত্র আমার ওখানে যাওয়া-আসা করেন,—কাজেই আমি হয়ত তাঁর বিপদে কোনও কাজের ভার নিতে পারি, সেই সন্দেহ করেছে। আচ্ছা, করুক, তুমি চল মামা, একটা রিক্সা বরং ডাকো—দুজনে তাতেই যাই।"

তাহাই হইল, একটা রিক্সায় উভয়ে বাড়ী ফিরিলেন।

কৃষ্ণার পরামর্শানুসারে প্রণবেশ বৈকালে থানায় গিয়া ইন্সপেক্টার মিঃ চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে গোপনে কিছু কথাবার্ত্তা বলিয়া আসিলেন।

বৈকাল হইতে আকাশে মেঘ জমিয়া ছিল, সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে-সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কৃষ্ণা বলিল, "আসুক বৃষ্টি, তবু আমরা ভয় পাব না, কি বল মামা ?"

প্রণবেশ একটু মুসড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। বলিলেন, "ও-অঞ্চলটা তত সুবিধার নয় কিনা, বাগবাজারের খালের ওধারে বস্তীগুলোতে যত বদলোক থাকে—"

কৃষ্ণা বাধা দিয়া বলিল, "তাতো জেনেই যাচ্ছি। যাক, তুমি ততক্ষণ প্রস্তুত হও, আমিও প্রস্তুত হয়ে আসি।"

আজই দুপুরের দিকে প্রণবেশ গিয়া স্থানটাকে চিনিয়া আসিয়াছেন, রাত্রির অন্ধকারেও খালের ওধার চিনিয়া যাওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য হইত না—যদি এই বৃষ্টিটা না আসিত।

প্রণবেশ প্রস্তুত হইয়া লইলেন। কৃষ্ণা তখনও আসে নাই, ঘড়িতে এদিকে প্রায় নয়টা বাজে। ভবানীপুর হইতে বাগবাজার বাসে যাইতেও বড় কম সময় লাগিবে না—সেজন্য প্রণবেশ চঞ্চল হইয়া কৃষ্ণাকে ডাকিবার জন্য ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন।

এমনই সময় বাহিরের দরজা-পথে ঘরে প্রবেশ করিল একটি কিশোর ছেলে—একখানা লুঙ্গি তার পরণে, গায়ে একটা ডোরা-কাটা বেনিয়ান, মাথায় একটা পাঞ্জাবী-ধরণের পাগড়ি, পায়ে নাগরা।

বিস্মিত-চোখে প্রণবেশ তাহার পানে তাকাইয়া আছেন

দেখিয়া সে হাসিয়া উঠিল—"আমায় তাহলে সত্যই চেনা যাচ্ছে না মামা! সাজটা বেশ ভালো হয়েছে স্বীকার কর?"

—"আরে আমাদের কৃষ্ণা!"

বাস্তবিকই চেনা যায় না। প্রণবেশ যাহাকে চব্বিশ ঘণ্টা দেখিতেছেন, তাহাকে ছদ্মবেশে দেখিয়াও যখন চিনিতে পারিলেন না, তখন বুঝা যায়, কৃষ্ণার ছদ্মবেশ নির্ভুল হইয়াছে।

প্রণবেশ মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "কেউ বুঝতে পারবে না মা, কেউ তোমায় চিনতে পারবে না, এ-বিষয়ে আমি তোমায় একেবারে অভয় দিচ্ছি। কিন্তু আর তো দেরী করলে চলবে না, নটা যে বাজলো!"

কৃষ্ণা বলিল, "আর দেরী কিসের! আমি ঝি-চাকর দারোয়ান সকলকে বলে এসেছি, আর ওদের বলার দরকার নেই, তুমি সুটকেশটা নিয়ে বার হয়ে এসো।"

সদর রাস্তায় আসিয়া উভয়ে বাসে উঠিলেন।

পাশের সিটে কুলিবেশী দুইজন কনেষ্টবল মিঃ চ্যাটার্জ্জির আদেশে প্রণবেশের সঙ্গে চলিয়াছে, খালের ওধারে মিঃ চ্যাটার্জ্জি নিজে থাকিবেন।

কৃষ্ণা তাহার চিরসঙ্গী রিভলভারটি লইতে ভুলে নাই। পকেটে সে ইহা রাখে নাই, কোমরবন্ধে সন্তর্পণে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। প্রণবেশের নিকটেও একটা রিভলভার ছিল, যদিও গুলি ছোড়া প্রণবেশের অভ্যাস নাই, তথাপি কাজে লাগিতে পারে।

শ্যামবাজারের মোড়ে বাস হইতে নামিয়া ব্রীজ পার হইয়া প্রণবেশ বামদিককার পথ ধরিলেন। কৃষ্ণা পাশে চলিল; কুলিবেশী কনেস্টবল দুইজন দূরে-দূরে চলিল।

খালের ধারে কয়েকখানা নৌকা নোঙর-করা আছে। একখানাতে মাদল বাজাইয়া দাঁড়ি-মাঝিরা গান ধরিয়াছিল, বেশ বুঝা যায় তাহারা প্রকৃতিস্থ নাই।

পথে একজন লোকের সঙ্গে প্রণবেশের ধাক্কা লাগিয়া গেল, প্রণবেশ চটিয়া উঠিলেন—হয়তো হাতাহাতিই করিয়া বসিতেন! "কৃষ্ণা চুপি-চুপি বলিল, "চিনতে পারছো না মামা, মিঃ চ্যাটার্জ্জি!"

পাশে-পাশে চলিতে-চলিতে ইন্‌স্পেক্টার মিঃ চ্যাটার্জ্জি চাপা-স্বরে বলিলেন, "চারিদিকে পুলিশ রেখেছি, আজ ঠিক ধরা যাবে। আপনারা কি টাকা এনেছেন সঙ্গে?"

কৃষ্ণা হাসিল, "পাগল! আপনার কথাই শুনেছি মিঃ চ্যাটার্জ্জি, সুটকেশে কেবল কাগজ-ভরা।"

—"আচ্ছা, আমি চলছি, লোক আসছে—"

মাতালের মত টলিতে-টলিতে মিঃ চ্যাটার্জ্জি একটা গানের সুর ভাঁজিতে-ভাঁজিতে একটা গলি-পথে চলিয়া গেলেন।

আর খানিকদূর গিয়া একটা গলির মুখে একটা লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা গেল। কর্কশকণ্ঠে সে বলিল, কে তোমরা? এখানে কাকে চাই?"

কৃষ্ণা উত্তর দিল, "এখানে—নং বাড়ীতে দরকার আছে।"

লোকটা সরিয়া দাঁড়াইল।

অন্ধকার পিছলপথে সাবধানে চলিতে চলিতে প্রণবেশ ভয়ার্ত্ত মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "লোকটা দলের লোক, বাড়ীর নম্বর জেনেই ছেড়ে দিলে—দেখলে তো? যাই হোক, এই বস্তিতে আসা আমাদের উচিত হলো না কৃষ্ণা! এই জলকাদা আর এই রাত, আলো প্রায় নেই বললেই হয়। এ রকম জায়গায় লোকে হাজার চীৎকার করলেও কোন লোক আসবে না।"

কৃষ্ণা বলিল, "তুমি চুপ কর মামা! আমাদের আশপাশে অত পুলিশ, নিজে মিঃ চ্যাটার্জ্জি রয়েছেন, ভয় পাওয়ার কারণটা কি? কিছু বেগতিক দেখলেই হুইসল্ দেবে, চারিধার হতে পুলিশ এসে পড়বে, ওরা দলশুদ্ধ গ্রেপ্তার হবে, আমরাও দেবুকে পাব।"

বলিতে-বলিতে পাশের ঘরের দরজার উপর দৃষ্টি পড়িল—বলিল, "এই তো সেই নম্বর মামা!"

প্রণবেশ পকেট হইতে টর্চ্চ বাহির করিয়া সেই আলোতে নম্বর দেখিলেন, বলিলেন "হ্যাঁ, সেই নম্বরই বটে।"

কৃষ্ণা বলিল, "তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি সুটকেশটা ওখানে নামানোর সঙ্গে-সঙ্গে হুইসল্ দিয়ো।"

সে বারাণ্ডায় উঠিয়া দরজায় আঘাত করিতেই দরজা খুলিয়া গেল, কৃষ্ণা ভিতরে প্রবেশ করিল।

হুইসল্ বাহির করিবার অবকাশ প্রণবেশ পাইলেন না; পকেটে হাত দিবার সঙ্গে-সঙ্গে মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত,—প্রণবেশের চক্ষুর সামনে সব-কিছু ঝাপসা হইয়া গেল, কাঁপিতে-কাঁপিতে তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

মনে হইল—কৃষ্ণার চীৎকার কানে আসিল কিন্তু প্রণবেশ তখন সংজ্ঞাহীন।

এগারো

পরদিন সংবাদ-পত্রে বড়-বড় অক্ষরে প্রকাশিত হইল—"ভীষণ কাণ্ড! বাগবাজার-খালের নিকটে ভয়ানক ব্যাপার!"

তাহার পরে লেখা—

"আমাদের দেশের লোক নিশ্চয়ই কুমারী কৃষ্ণা চৌধুরীর কথা আজও ভুলিয়া যান নাই। এই অল্প বয়স্কা মেয়েটি সত্যই বাঙ্গালীর গৌরব। সম্প্রতি ইঁহাকে পাওয়া যাইতেছে না। কুমারীর ডিটেক্‌টিভ কাজের উপর আগ্রহই তাঁহাকে ঘরছাড়া করিয়া বাহিরে টানিয়া আনিয়াছিল। পাঠকের স্মরণ আছে, বসিরহাটের এস. ডি. ও. মিঃ মিত্রের ছেলেটি কিছুদিন পূর্ব্বে অপহৃত হয়। এই ছেলেটি কুমারীর আত্মীয়। যদিও ছেলেটিকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করার ভার পুলিশের হাতে দেওয়া হইয়াছে, তথাপি অদম্য উৎসাহ-বশে কুমারী নিজেও তাহার অনুসন্ধান-ব্যাপারে যুক্ত হন। সম্ভবতঃ, কোন সন্ধান পাইয়া তিনি তাঁহার মাতুল প্রণবেশ বাবুর সহিত গতকল্য রাত্রে খালের ধারে যান। পুলিশ প্রণবেশ বাবুকে একটা গলির মধ্যে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পাইয়াছে, দুর্দ্দান্ত লোকদের লাঠির আঘাতে তাঁহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে। কুমারীর কোন সন্ধান নাই। প্রণবেশ বাবুকে মেডিকেল কলেজে দেওয়া হইয়াছে, তিনি সুস্থ হইয়া না-ওঠা পর্য্যন্ত কুমারীর সম্বন্ধে কিছু জানা যাইবে না।"

মনিহারী দোকান করিয়া তাহার আয়ে স্বচ্ছন্দে দিন চালাইতেছে।

ব্যোমকেশ জানেন সে অনেক সন্ধান রাখে, সেই জন্য সেই সন্ধ্যায় তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক কাল আবদুলের সহিত তাঁহার দেখা হয় নাই। বলা বাহুল্য, আবদুল তাঁহাকে দেখিয়া ভারি খুসি হইল, তাড়াতাড়ি একখানা টুল পাতিয়া দিল।

টুলের উপর বসিয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাজ-কর্ম্ম আজকাল কেমন চলছে আবদুল? অনেকদিন তো আমাদের ওদিক যাওনি, মাস আষ্টেক হবে বোধহয়—না?"

কুণ্ঠিত হইয়া আবদুল বলিল, "ছেলেমেয়ে সব দেশ হতে এসেছে কিনা, তাদের নিত্য অসুখ-বিসুখ, এই দোকান-চালানো—এক দণ্ড ফুরসুত পাইনে, সে জন্যে মাপ করবেন বাবু!"

দু পাঁচটা সাংসারিক কথাবার্ত্তার পর গলার সুর একেবারে খাদে নামাইয়া ব্যোমকেশ বলিলেন, "একটা জরুরী দরকারে তোমার কাছে এসেছি আবদুল, তা বোধ হয় বুঝেছ?"

হাসিয়া আবদুল বলিল, "তা বুঝেছি বই কি বাবু! দরকার না থাকলে আপনি আবদুল মিঞার দোকানে আসবেন না তা জানি। বলুন—আপনার কি দরকার? জানা থাকলে উত্তর দিব।"

ব্যোমকেশ বলিলেন, "তোমার তো অনেক লোকের সঙ্গে চেনা-শোনা আছে, খাঁজাহান নামে কাউকে চেনো? সে জেলের মধ্যেই খুন করে দ্বীপান্তরে যেতে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়ে যায়?"

আবদুল হাসিল, বলিল, "তাই বলুন! আপনি খাঁজাহানকে খুঁজতে এসেছেন? কিন্তু তাকে তো আর এখানে পাবেন না বাবু। কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে এখানে ছিল, রাত্রে চলে গেছে।"

আশ্চর্য্য হইয়া ব্যোমকেশ বলিলেন, "কোথায় চলে গেল?"

আবদুল বলিল, "বোধহয় তার নিজের দেশে গেছে।

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ট্রেনে গেছে?"

আবদুল বলিল, "ঠিক বলতে পারি নে। তার নিজের বজরা আছে, নৌকোও আছে; কিসে যে গেল, তা জানি না।"

ব্যোমকেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তুমি ঠিক বলতে পারবে আবদুল এই খাঁজাহান লোকটা কিসের ব্যবসা করে? আমি শুনেছি সে নাকি ছেলে-মেয়ে চুরির ব্যবসা করে, এ পর্য্যন্ত অনেক ছেলে-মেয়ে সে চুরি করেছে, তাদের দিয়ে নানা রকম কাজ করিয়েছে; এ সব সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো?"

আবদুল বলিল, "কতকটা জানি বাবু। সম্প্রতি একটি

ছেলেকে দেখেছি, চমৎকার ফুটফুটে ছেলে! এই কিছু দিন আগে কোথা হতে তাকে ধরে এনেছে। তাকেও বোধ হয় কাল সঙ্গে করে নিয়ে গেছে, সে নিজে সেখানে গেছে। আপনি তার খোঁজ নিতে যদি কাল আসতেন, আমি ঠিক খোঁজ দিতুম।

আপনার অনেক নিমক খেয়েছি বাবু, নিমকহারামী করলে আমার সর্ব্বনাশ হবে। সেই জন্যই আপনি যার খোঁজ চাইবেন, জানাশোনা থাকলেই বলে দেব। খাঁজাহানের এখানে দুই জায়গায় ডেরা ছিল, একটা বাগবাজারের খালের ওধারে বস্তিতে—যেখানে ওই এক ভদ্রলোকের মাথা ফেটেছে সেইখানে। আর একটা আছে বড়বাজারে, সেখানে হিন্দু কয়েকজন লোক তার কাজ চালায়। আমি নম্বর দিচ্ছি, আপনি গিয়ে খোঁজ নেবেন।"

সে একখানা কাগজে দু জায়গার নম্বর লিখিয়া দিল, ব্যোমকেশ উঠিলেন।

সে রাত্রে তিনি বাহির হইলেন না, পরদিন দুইজন কনস্টেবল সহ একবার বড়বাজারে ও একবার বাগবাজারে অনুসন্ধান করিলেন। দুই স্থানই শূন্য, কেহ নাই। বিফল-মনোরথ হইয়া ব্যোমকেশ ফিরিলেন।

বারো

কৃষ্ণা বন্দিনী হইয়াছে।

কি অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘর! ইহার উপর কতকগুলা বিচালী পাতা, তাহার উপর একখানা বিলাতী কম্বল বিছানো, ইহাই কৃষ্ণার শয্যা।

মাথার পাগড়ী খুলিয়া কোথায় পড়িয়াছে, কে জানে? কৃষ্ণার চুলগুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

সেই অন্ধকার ঘরে কৃষ্ণা একবার কোমর-বন্ধটা পরীক্ষা করে। না, রিভলভারটা ঠিকই আছে; কেহ তাহার গায়ে হাত দেয় নাই।

কি আশ্চর্য্য ঘরখানা!—কৃষ্ণা তাহাই ভাবে।

মামাকে পথে রাখিয়া অসীম-সাহসে ভর করিয়া সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। পত্রে লেখা ছিল—টাকা রাখিয়া পিছনে চাহিবে না, সোজা বাহির হইয়া আসিতে হইবে।

কিন্তু খাঁজাহান কাঁচা ছেলে নয়। সে পূর্ব্বাবধি সন্ধান রাখিয়াছে। ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে, খালের মধ্যে নৌকায় তাহার লোক আছে, সে সব সন্ধান রাখে। কৃষ্ণা যে পুলিশ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, সে তাহা জানে।

কৃষ্ণা ঘরে পা দিতেই দরজাটা বন্ধ হইয়া গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের মেঝেটা সর্‌সর্‌ করিয়া নিচের দিকে নামিয়া গেল।

সকলেরই হাতে উদ্যত রিভলভার !

[পৃঃ—১০৬

কৃষ্ণা প্রথমটায় একটু ভয় পাইয়াছিল, তাহার পরই পড়িয়া যাইবার ভয়ে চট্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

ঘরের মেঝে যেখানে আসিয়া স্থির হইল, তাহার চারিদিকে দেয়াল ;—অনুমানে মনে হয়, এটা ভূগর্ভস্থ একটা ঘর। আলো না থাকিলেও বাতাস আছে, বেশ ঠাণ্ডাও আছে। কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া বাতাস আসিতেছে তাহা কৃষ্ণা বুঝিতে পারিল না। অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া সে ঘরের অবস্থানটা বুঝিয়া লইল—বিছানাটাও দেখিয়া লইল।

চমৎকার!

কোথায় দেবুকে মুক্তি দিবার জন্য—মায়ের কোলে তাহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য সে আসিয়াছিল, অবশেষে সে নিজেই হইল বন্দিনী! এখন তাহার উদ্ধারের উপায় করিবে কে? কৃষ্ণা অধর দংশন করিল।

প্রণবেশ কোথায় রহিল কে জানে? এমনও হইতে পারে, ইহারা তাহাকেও বন্দী করিয়াছে! হয় তো কৃষ্ণার পাশে এমনই একটা ঘরে তাহাকে রাখিয়াছে, কৃষ্ণার মত প্রণবেশও মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে!

নাঃ, ওসব ভাবনা থাক্, কৃষ্ণাকে আগে দেখিতে হইবে মুক্তির পথ কোন্‌দিকে,—বাতাস আসার গতি নির্ণয় করিয়া সেই গতিপথে তাহাকে চলিতে হইবে।

আলো হইতে অন্ধকারে আসিলে অন্ধকারের তীব্রতা বেশী অনুভূত হয় ; কিন্তু অন্ধকারে থাকিতে গেলে তাহার মধ্য দিয়াই

অনেক কিছু দেখা যায়। খানিকক্ষণ দৃষ্টি চালনা করিয়া কৃষ্ণা বুঝিল, ঘরটার উপরের দিক ফাঁকা, কাঠের ছাদ দেওয়া। কোন স্প্রীংয়ের সাহায্যে ছাদটা সর্-সর্ করিয়া নিচে নামিয়া যায় এবং কোন কিছু তাহার উপর থাকিলে, কাতভাবে ঢালিয়া দিয়া আবার সোজাভাবে উপরে উঠিয়া যায়।

দেয়ালে দুইটা কিল দিয়া সে বুঝিল, দেয়াল পাতলা কাঠের। ওধারেও শব্দ হইতেছিল। দেয়ালের গায়ে কান রাখিয়া কৃষ্ণা বুঝিল, ওধারেও কেহ আছে, তাহার কিলের প্রত্যুত্তরে সেও দেয়ালের গায়ে দুইটা কিল বসাইয়া তাহার অস্তিত্ব জানাইতেছে।

কে ওখানে ?—প্রণবেশ, দেবু—অথবা তাহারই মত আরও কাহাকে পাশের ঘরে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে ?

কৃষ্ণা চারিদিকে চাহিল।

অনেক উপরে একটা জাফরী দেখা যায়, সেখান হইতে বাতাস আসিতেছে বুঝা গেল। বাহিরের বাতাস আসিবার সোজা পথ পাইয়াছে, আলো সোজাভাবে আসিতে পারে নাই। হয়তো ওই জাফরী দিয়া ওধারে কে আছে তাহা দেখা যাইবে !

কিন্তু অত উপরে সে নাগাল পাইবে কেমন করিয়া ?

কৃষ্ণা যখন উপায় চিন্তা করিতেছে এমনই সময় লোহার দরজাটা ঝন্-ঝন্ করিয়া খুলিয়া গেল। কৃষ্ণা চাহিয়া দেখিল, দরজার উপর একটা লম্বা লোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ওখানে যে দরজা আছে তাহা কৃষ্ণা দেখে নাই, এতক্ষণে দৃষ্টি পড়িল। দরজার ওধারেও অন্ধকার, তবে এমনভাবে জমাট বাঁধিয়া নাই। একটু হালকা থাকার জন্য মানুষটিকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

কৃষ্ণার মনে হইল, দরজার বাহিরে এই ভূগর্ভে নামিবার জন্য একটা সিঁড়ি আছে, সেই সিঁড়ি হয়তো উপরকার কোন ঘরের মধ্য দিয়া নামিয়া আসিয়াছে।

লোকটির হাতে টর্চ্চ ছিল, সেই টর্চ্চের আলো ফেলিয়া সে ঘরের ভিতরটা দেখিয়া লইল। কৃষ্ণার চোখের উপর তীব্র আলো লাগিতেই সে দুই হাতে চোখ ঢাকিল।

লোকটা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—বিশ্রী কর্কশ হাসি।

খানিক্ষণ হাসিয়া, হাসি থামাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর আছ কেমন মেয়ে-গোয়েন্দা ? ঘোল খাচ্ছো তো ?"

দারুণ ঘৃণায় কৃষ্ণা উত্তর দিল না।

লোকটি বলিল, "তোমার বাহাদুরি আছে বটে, সে জন্যে তোমায় প্রশংসা না করে পারিনে। পুরুষে যা করতে ভয় পায়, মেয়ে হয়ে তুমি তাই করতে এসেছো। কিন্তু বুঝতে পারোনি—তুমি এসেছো খাঁজাহানের গর্ত্তে, যে তোমাকে কোনরকমে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করছিল, তুমি নিজেই এসে তাঁর গর্ত্তে ঢুকেছো। বুঝলে মেয়েটি—আমিই সেই খাঁজাহান, একবার চেয়ে দেখ।"

টর্চ্চের আলো সে নিজের মুখের উপর ফেলিল।

কি কদাকার চেহারা! কৃষ্ণা যেমন শুনিয়াছিল, তাহা অপেক্ষাও ভীষণ।

ঘৃণা হইল—ভয় হইল না। ভয় কৃষ্ণার হয় না—তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় আনবার চেষ্টা করেছিলে কেন?"

খাঁজাহান বলিল, "শুনলুম তুমি নাকি ছেলেটাকে বার করবার ভার নিয়েছো, তাই। তুমি বড় চালাক মেয়ে, তাই আমাদের হাকিম সাহেব টাকা দিলেও তুমি সে টাকা আনোনি। চারিদিকে পুলিশ-পাহারার ব্যবস্থা করে স্যুটকেশ ভরে কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে এসেছো। তুমি জানো না, তোমার বাড়ী হতে আমার লোক তোমাদের পিছু নিয়ে এসেছে, তোমার আর তোমার মামাকে এ পর্য্যন্ত আসবার অবকাশ আমিই দিয়েছিলুম, কেন না—"

বাধা দিয়া উৎসুককণ্ঠে কৃষ্ণা বলিল, "আমার মামা কোথায়? তাঁকেও বন্দী করেছো নাকি?"

গম্ভীর হইয়া খাঁজাহান বলিল, "না, নীরেট লোকটাকে আটক করে রেখে তো কোন লাভ নেই! নিজে হ'তে কিছু করবার ক্ষমতা তার নেই—কোনদিন হবেও না। তার মাথায় এক লাঠির ঘা বসিয়ে তাকে হাঁসপাতালে পাঠানো হয়েছে, কিছুদিন সেখানে থাকবে—বুঝলে?"

কৃষ্ণা একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, বলিল, "বুঝেছি। দেবুকে তাঁর বাপের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে আটকেছো, আমিও

যাতে তার সন্ধান না করতে পারি তার জন্যে বন্দী করেছো। কিন্তু আমাদের নিয়ে করবে কি শুনি ?"

—"কি করবো ?"

টুকরা-টুকরা হাসি হাসিয়া খাঁজাহান বলিল, "কি করব তা আজ রাত্রেই দেখতে পাবে !"

তাহার সে হাসি দেখিয়া কৃষ্ণা চিন্তিত হইল, বলিল, "খুন করবে ?"

খাঁজাহান বলিল, "খুন করলে তো সবই ফুরিয়ে যাবে, আমার তাতে লাভ হবে কি ? সোজা কথায় বলছি শোন। তোমরা এখান থেকে চালান হবে। আচ্ছা, বারোটা বাজে, লক্ষ্মী হয়ে বিছানায় শোও, আমি একবার দেখে গেলুম তুমি কি করছো। এখানে তুমি যত যাই করো না, বাইরের কেউ শুনতে পাবে না। এ ঘর মাটির মধ্যে—তা সহজেই বুঝতে পারছো। কলকাতার মত জায়গায় এ-রকম ঘর থাকে ভেবে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছো—কেমন ? এ-রকম কল্পনা তুমি বোধ হয় কোনদিন করও নি। আচ্ছা—আমি চললুম।"

ঝন-ঝন্ করিয়া আবার দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

টর্চ্চের আলোয় কৃষ্ণা দেখিয়াছিল—ঘরের দেয়ালে মাঝে-মাঝে এক-এক জায়গা উঁচুমত আছে, কোন রকমে সেই উঁচু জায়গায় পা রাখিয়া উপর দিকে উঠা যায়।

খাঁজাহান চলিয়া যাওয়ার খানিকক্ষণ পরে সে দেয়ালে আবার কিল মারিল,—ওদিক হইতেও শব্দ হইল।

ওদিকে যে আছে, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য কৃষ্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল।

উঁচু জায়গায় পা দিতে পা পিছলাইয়া যায়, হাতেও কিছু ধরা যায় না। কৃষ্ণা মেঝেয় হাত ঘসিয়া খস্‌খসে করিয়া লইল,—কোন রকমে এইটুকু উঠিয়া সে যদি জাফরীটা ধরিতে পারে, অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ-দশ মিনিট সে ঝুলিয়া থাকিতে পারিবে!

প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় জাফরীর কাছাকাছি গিয়া পিছলাইয়া পড়িতে-পড়িতে কৃষ্ণা জাফরী ধরিয়া ফেলিল, তাহার পর দুই হাতে ভর দিল।

ও-ঘরের বন্দী জানে না, এ-ঘরে এই মেয়েটি কেবল তাহার সাড়া লইবার জন্য দীর্ঘস্থায়ী পরিশ্রম করিতেছে—সে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়াছে।

কৃষ্ণা ডাকিতে লাগিল, "এ-ঘরে কে ?"কে আছ সাড়া দাও, কথা বল।"

নিদ্রিত বন্দীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—"কে, কৃষ্ণা দি'? তুমি এসেছো? আমায় মুক্তি দিতে এসেছো?"

—"অ্যাঁ—দেবু!"

কৃষ্ণা মাথা ঘুরিয়া প্রায় পড়িয়া যায় আর কি!

দেবু জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় কৃষ্ণা দি'?"

কৃষ্ণা উত্তর দিল, "এই যে—তোমার মাথার ওপরে এই

জাফরীতে। তোমায় মুক্ত করতে এসে আমিও বন্দী হয়েছি যে—এই আজই রাত্রে!"

দেবু হতাশায় কাঁদিয়া ফেলে, "সর্ব্বনাশ! তাই এরা আর খানিক আগে বলছিল—আমাদের দুজন বন্দীকে নিয়ে আজই ওদের নৌকো ছাড়বে, আমাদের নাকি অজ্ঞান করে নিয়ে যাবে। আমি তো জানি নে তুমি এসেছো, ভাবছি আর কাকে আটক করেছে। কি হবে কৃষ্ণা দি'—আমি মুক্তি পাব না?"

কৃষ্ণা উত্তর দিবার আগেই আবার ঝন্-ঝন্ করিয়া শব্দ হইল, সঙ্গে-সঙ্গে ও-পাশটায় ধুপ করিয়া শব্দ হইল। কৃষ্ণা বোধ হয় উপর হইতে পড়িয়া গেল!

দেবু শুনিল, পাশের দিকে দুম্‌দাম্ শব্দ! একবার রিভলভারের শব্দ হইল, গুলিটা দেবুর দিক্‌কার দেয়ালে আসিয়া বিঁধিল। ভীত দেবু দুই হাতে কান ঢাকিয়া তাহার বিছানায় মুখ গুঁজিল।

কখন ঘুম আসিল—দেবু নিস্তব্ধভাবে ঘুমাইতে লাগিল।

আস্তে-আস্তে দরজাটা খুলিয়া দুইজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল, পিছনে লণ্ঠন হাতে খাঁজাহান।

সে আদেশ দিল, "এটাকেও ক্লোরোফর্ম্ম দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলো। হাত-পা বাঁধতে হবে না, নৌকোয় নিয়ে গিয়ে সেই ওষুধটা এক ডোজ খাইয়ে দিলে দুইদিন জাগবে না, তার মধ্যে তোমরা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে পৌঁছাবে। মেয়েটাকেও

অজ্ঞান করা হয়েছে, দুজনকে ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় রেখো, হঠাৎ জ্ঞান হলেও কেউ যেন কাউকে দেখতে না পায়।"

ঘুমন্ত দেবুর ক্লোরোফর্ম্মে আরও নিবিড় ঘুম আসিল। খাঁজাহানের আদেশে লোক দুইটি তাহাকে বহন করিয়া লইয়া চলিল।

চলিতে-চলিতে খাঁজাহান বলিল, "মেয়েটা বড় শয়তান। ওর কাছে যে রিভলভার ছিল, তা আগে দেখা হয় নি। গায়ে জোরও আছে, বাঙ্গালী মেয়েদের মত দুর্ব্বল নয়। আমি কাল-পরশু রওনা হব, তোমরা ততক্ষণ এগিয়ে যাও। মেয়েটাকে খুব সাবধান, সেটা যেন কেউটে সাপের বাচ্চা!"

রাত্রি তখন তিনটা,—

নিস্তব্ধ পথ বাহিয়া লোক দুইটি মূর্চ্ছিত দেবুকে লইয়া খালে নৌকায় উঠিল।

সবাই প্রস্তুত ছিল—খাঁজাহান ইঙ্গিত করিতেই নৌকা ছাড়িয়া দিল।

তেরো

যখন কৃষ্ণার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার নিজেকে ভারি দুর্ব্বল মনে হইতেছিল। বোধ হইতেছিল কতকাল সে যেন রোগশয্যায় পড়িয়া আছে, মোটে নড়িবার ক্ষমতাও তাহার নাই।

ক্ষীণকণ্ঠে সে ডাকিল, "এখানে কে আছো ? একটু এদিকে এসো—একটু জল দাও—"

কালো পোষাক-পরা একজন লোক ভিতরে প্রবেশ করিল, এ সেই লোকটি—যে দেবুর ভার লইয়াছিল।

লোকটি জিজ্ঞাসুভাবে মুখ নাড়িল, অর্থাৎ—"কি চাই ?"

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া কৃষ্ণা বুঝিল সে কথা বলিতে পারে না ; কৃষ্ণা বলিল, "একটু জল দাও।"

লোকটা পাশের কুঁজা হইতে একটা গ্লাসে জল গড়াইয়া আনিল। কৃষ্ণা গ্লাসটা কম্পিত হস্তে ধরিতে গেল। সে ইসারায় নিষেধ করিয়া চামচে করিয়া কৃষ্ণার মুখে অল্প-অল্প করিয়া জল ঢালিয়া দিল।

জল পান করিয়া কৃষ্ণা তাহার পানে তাকাইল, আনমনেই বলিল, "চাকরটি জুটেছে ভালো—বোবা ! কালা বোধ হয় নয়, কালা হলে ডাক শুনতে পেত না।"

লোকটি বাহিরে চলিয়া গেল।

কৃষ্ণা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

একটি পুরাতন জরাজীর্ণ ঘর, দেয়ালের চুন-বালি খসিয়া গিয়া ছোট সাইজের ইঁট বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইঁটের গড়ন দেখিয়া মনে হয়, বহু প্রাচীন যুগে এগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল—বর্ত্তমান যুগের নয়। ঘরের কোনদিকে জানালা নাই—চারিদিক মন্দিরের ধরণে গোল ভাবে গাঁথা, উপর দিকে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। ঘরের এই গড়ন দেখিয়া মনে হয়—এটি কোন দেবতার মন্দির ছিল, বর্ত্তমানে হইয়াছে কৃষ্ণার বন্দীশালা।

বহুক্ষণ চেষ্টার পর কৃষ্ণা উঠিয়া বসিল। এই সময় কালো পোষাক-পরা লোকটি নির্ব্বাকে একটি পাত্রে গরম দুধ আনিয়া দাঁড়াইল এবং ইঙ্গিতে দুধটা খাইতে বলিল।

কৃষ্ণা দুধ খাইয়া লইয়া পাত্রটা তাহাকে ফিরাইয়া দিল। তাহার পর আস্তে-আস্তে উঠিল।

হাঁটুতে যেন জোর নাই—মাথা ঘোরে, দেহ টলে! সে দেয়াল ধরিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল—লোকটা কোন বাধা দিল না।

দরজার কাছে আসিয়া কৃষ্ণা বসিয়া পড়িল।

এ কি নিবিড় বন! অদূরে দেখা যাইতেছে সুউচ্চ পর্ব্বত-শ্রেণী, একটার পর একটা মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান। পর্ব্বতের নিচে এই গভীর বন—হয়তো মন্দিরের চারিদিক এমনই বনে ঢাকা, পাহাড়ে ঘেরা।

কৃষ্ণার আর্ত্তকণ্ঠে একটি মাত্র শব্দ বাহির হইল, শব্দটা

নিজের কানে পৌঁছাইবার সঙ্গে-সঙ্গে সে সামলাইয়া গেল। মুখ ফিরাইয়া দেখিল—তাহার নির্ব্বাক সঙ্গীটি ছায়ার মত তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া আছে।

আস্তে-আস্তে কৃষ্ণা ফিরিল—আবার আসিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল, ক্লান্ত চোখ দুইটি তাহার মুদিয়া আসিল।

একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—হঠাৎ কি একটা শব্দে কৃষ্ণার সে তন্দ্রা-ভাব দূর হইয়া গেল। খোলা দরজার দিকে তাকাইয়া সে সভয়ে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

প্রকাণ্ড বড় একটা সাপ—পাহাড়ী অজগর, বিরাট শরীর লইয়া প্রায় নড়িতে পারে না। এত বড় আর এত মোটা সাপ কৃষ্ণা কেন—অনেকেই চোখে দেখে নাই!

সাপটা খোলা দরজার উপর থাকিয়া এতখানি মাথা উঁচু করিয়া কৃষ্ণার পানে তাকাইয়া ছিল, তাহার চোখ দুইটা যেন জ্বলিতেছিল, জিভটা বার-বার বাহির করিতেছিল।

অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতার মত কৃষ্ণা শুধু তাহার পানে চাহিয়া রহিল। সে এতটুকু নড়িতে পারিল না, একটা শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিল না।

তাহার নির্ব্বাক সঙ্গী কোথায় গেল? হয়তো এই বিরাট-কায় জীবটিকে দেখিয়া দূরে পলাইয়াছে! প্রাণের ভয় সকলেরই আছে তো!

সাপটা সর-সর করিয়া ঘরে ঢুকিল, দড়ির খাটিয়ায় বসিয়া

কৃষ্ণা সভয়ে চক্ষু মুদিল। সে বেশ বুঝিতেছিল, এই ঘরটা এই সাপের বিশ্রাম-স্থল, হয় তো বনে-বনে ঘুরিয়া আশ্রয় লইতে সে এখানে আসে। অনাহুত কৃষ্ণা আজ তাহার আশ্রয়-স্থল দখল করিয়াছে, কৃষ্ণাকে সে কোন মতেই ক্ষমা করিবে না।

আস্তে-আস্তে কৃষ্ণা আবার চোখ মেলিল—সাপটা নির্জীবের মত মেঝেয় শুইয়া আছে। ভাল করিয়া চাহিয়া কৃষ্ণা দেখিল, বিরাটকায় সাপটি লম্বায় দশ-বারো হাতের কম নয়, পরিধিও তাহার তেমনই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কৃষ্ণা আড়ষ্টভাবে এই ভীষণ জীবের সামনা-সামনি বসিয়া রহিল।

ঘণ্টাখানেক পরে সাপটি নড়িল, তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত অতি সুন্দর একটি হিল্লোল চলিয়া গেল, আস্তে-আস্তে মাথা তুলিয়া সে একবার কৃষ্ণার পানে তাঁকাইয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে কৃষ্ণার বডিগার্ড বোবা লোকটি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল, তাহার দুই চোখ বিস্ফারিত! মুখে একটা আঙ্গুল দিয়া অপর হাতখানা দিয়া সঙ্কেতে সে বুঝাইবার চেষ্টা করিল—"উঁ—উঁ—উঁ—"

এতক্ষণে কৃষ্ণার সাহস ফিরিয়া আসিল। সে বেশ বুঝিল, বোবা লোকটি পাশেই কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ভয়ার্ত্ত ভাব দেখিয়া সাহস দিবার জন্য সঙ্কেতে সে বুঝাইল—

কোন ভয় নাই, সে নিজেও ভয় পায় নাই, সাপটা চলিয়া গিয়াছে।

ঠিক এমনই সময় এই দুর্গম জঙ্গল ও পাহাড়-ঘেরা স্থানে উপর্য্যুপরি কয়েকবার বন্দুকের শব্দ শুনিয়া কৃষ্ণা চমকাইয়া উঠিল। কালা লোকটি কিছুই শুনিতে পাইল না, কৃষ্ণা উঠিতেই সে বাধা দিল।

তাহার হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া কৃষ্ণা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। খানিক আগে যতটা দুর্ব্বল বলিয়া নিজেকে মনে হইতেছিল, এখন যেন তাহা অপেক্ষা অনেকটা জোর পাইয়াছে।

খানিক দূরে ধূম দেখা গেল—সঙ্গে-সঙ্গে আবার বন্দুকের শব্দ!

প্রহরী লোকটা কৃষ্ণার হাত ধরিয়া টানিল—দূরে ধূম দেখাইল—কেবল শব্দ করিল, "উঁ উঁ!"

রাগ করিয়া কৃষ্ণা বলিল, "থাক, হনুমানের মত আর উঁ উঁ করতে হবে না, আমি সব বুঝেছি।"

ফিরিয়া গিয়া সে আবার নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল।

মিনিট কুড়ি পরে বাহিরে তিন-চারজন লোকের পদশব্দ শুনা গেল, একজন বলিল, "কি জাঁদরেল সাপ! সাত-আটটা গুলি খেয়ে তবে মরলো!"

আর একজন বলিল, "আমি ও-ঘর হতে বার হলেই দেখি এই দরজা দিয়ে বার হচ্ছে। মেয়েটাকে কামড়ায় নি,

কামড়ালে সর্দ্দার আমাদের বাঁচতে দিতো না, তার এক-এক গুলিতেই আমরা সাবাড় হয়ে যেতুম।”

ইহাদের কথা হইতে কৃষ্ণা বুঝিল—কেবল বোবা-কালা লোকটি এখানে তাহার পাহারায় নাই, দলের আরও লোক আছে। তাহাতেই মনে হয়, এই মন্দিরের ওদিকে আরও ঘর আছে, হয় তো সেদিকে দেবুকে আনিয়া তাহারই মত অবস্থায় রাখিয়াছে।

সাপটাকে ইহারা মারিয়া ফেলিয়াছে, কৃষ্ণা সে জন্য শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। মরিতে সে ভয় পায় না—কিন্তু বীরের মত সে মরিতে চায়, সাপের কামড়ে মরিতে চায় না।

কৃষ্ণা ঠিক করিল, আর একটু জোর পাইলেই সে বাহির হইবে, চারিদিকটা একবার দেখিয়া লইবে।

হয় তো বোবা-কালা লোকটা এইবার দরজায় চাবি দিবে। কৃষ্ণার জ্ঞান না ফেরা পর্য্যন্ত দরজা খোলা ছিল, এখন জ্ঞান হইয়াছে, বড় বেশীক্ষণ তাহাকে মুক্ত রাখিবে না।

ভাবিতে-ভাবিতে নিজের অজ্ঞাতে কৃষ্ণা কখন ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বিস্মিত চোখে চাহিয়া দেখিল, তাহার অনুমানই সত্য হইয়াছে। ঘরের এক কোণে একটা প্রদীপ টিপ-টিপ করিয়া জ্বলিতেছিল ; তাহারই ম্লান আলোয় কৃষ্ণা দেখিল, একটি মাত্র দরজা বাহির হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ভেজানো আছে কি সত্যই বন্ধ হইয়া গিয়াছে, দেখিবার জন্য সে দরজার কাছে আসিয়া কপাট ধরিয়া টানিল—একবার জোরে ধাক্কা দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে বাহির হইতে রুক্ষকণ্ঠে কে বলিল, "চুপ করে থাক—আর দরজায় ধাক্কা দিতে হবে না। আমাদের রতনকে কালা বোবা আর ভালোমানুষ পেয়ে যখন-তখন বার হয়ে আসছিলে, এইবার বোঝ মজা ; আর বার হতে হবে না।"

কৃষ্ণা ফিরিয়া আসিল।

বুঝিল, তাহার উপর কড়া পাহারা সুরু হইল ; বাহিরের আলো পাওয়া তাহার পক্ষে কষ্টকর হইবে।

চৌদ্দ

উপায় চিন্তা করিতে কৃষ্ণাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।

প্রথম দিন তাহাকে যে লোকটা আহার্য্য দিতে আসিল, কৃষ্ণা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের সর্দ্দার এখানে এসেছে ?"

লোকটা খিঁচাইয়া উঠিল, "এসেছে নয়—এসেছেন বল।"

কৃষ্ণা ভুল সংশোধন করিল—বলিল, "আচ্ছা তাই, তিনি কি এসেছেন ?"

লোকটি বলিল, "আমি জানি নে। তোমায় খেতে দেওয়া হয়েছে খেয়ে নাও, তোমার সঙ্গে কথা বলা নিষেধ।"

কৃষ্ণা উঠিতে-উঠিতে বলিল, "তুমি না হয় কিছু বলবে না, তবু কথা বলতে পারো তো ? বাবা, কয়দিন একটা বোবা-কালা লোক যা দিয়েছিল, আমার প্রাণান্ত হতো তাকে ইসারা করতে-করতে।

সে আহার করিতে বসিল, লোকটা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

কৃষ্ণার কথা শুনিয়া সে খুসি হইয়াছে বুঝা গেল। কৃষ্ণা আহার করিতে-করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "যদি দরকার পড়ে তোমায় কি বলে ডাকব বলে দাও দেখি।"

লোকটি উত্তর দিল, "আমার নাম সীতারাম।"

—"সীতারাম—সীতারাম!"

কৃষ্ণা বার-কয়েক নামটা মুখস্থ করিল। বলিল, "যাক, আর ভুল হবে না। হাজার হোক, ঠাকুর-দেবতার নাম তো! ভোর-বেলা ঘুম ভেঙ্গে উঠেই সে নাম নিতে হয়।"

সীতারাম আরও খুসি হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণা আহার করিতে-করিতে কথায়-কথায় আলাপ করিয়া লইল, তাহার দেশ কোথায়, দেশে কে কে আছে—কি ভাবে তাহাদের দিন কাটে—ইত্যাদি।

প্রথম দিন এই ভাবে গেল।

দু-চার দিন কাটিয়া গেলে কৃষ্ণা একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "বলতে পারো সীতারাম, আমাকে এরা কি করবে?"

কয়দিনে সীতারাম এই ছোট মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মত ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে। কথায়-কথায় সেদিন বলিয়া ফেলিয়াছে, দেশে তাহার কৃষ্ণার মত একটি মেয়ে আছে—ঠিক এমনই গল্প করে।

সীতারাম কৃষ্ণার প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "সর্দ্দারের কথা আমি তো জানিনে। তবে সেদিন আমাদের রহিম ভাই বলছিল তোমায় নাকি আরাকানে নিয়ে যাবে—সেখানে মগদের কাছে বিক্রী করে সর্দ্দার কিছু টাকা পাবে।"

কৃষ্ণার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

শুনিতে পায়, খাঁজাহান মগ-সর্দ্দারকে খবর দিয়াছে, সেও

পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে আসিয়া পড়িবে এবং টাকা দিয়া কৃষ্ণাকে লইয়া যাইবে।

কৃষ্ণা নীরব হইয়া থাকে।

এ স্থানের কথাও সে সীতারামের মুখে শুনিতে পায়। এটা একটা মন্দিরই ছিল, ইহার ওদিকে আরও বারোটি এইরূপ মন্দির আছে। সর্দ্দার ছেলে-বিক্রয়ের ব্যবসা করে। এখানে উপস্থিত কয়েকটি ছেলে আছে, আর কয়েকটি সপ্তাহখানেকের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে চালান গিয়াছে। এই মন্দিরের ওধার দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ বহিয়া চলিয়াছে, এখানে নৌকাপথে সবাই যাওয়া-আসা করে। তিনদিকে ভীষণ বন—বড়-বড় পর্ব্বত-শ্রেণী, আর একদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ; এখানে হইতে কেহ কোন-দিন পলাইতে পারে নাই, পলাইলেও বাঘ-ভাল্লুকের আক্রমণে মরিতে হইবে।

কৃষ্ণা তথাপি পলায়নের আশা রাখে।

পাঁচ-সাত দিন পরেই আরাকানি মগ-সর্দ্দার আসিয়া পড়িবে, তখন আর তাহার পলাইবার যো থাকিবে না, যদি পলাইতে হয় এই উপযুক্ত সময়।

সেদিন খোলা দরজাপথে কাহার আর্ত্ত চীৎকার শুনিয়া সে চমকাইয়া উঠিয়াছিল। সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, একটা বাঙ্গালীর ছেলে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, তাহাকে ধরিয়া কোঁড়া অর্থাৎ কাঁটাওয়ালা চাবুক লাগানো হইতেছে। যাহারা পলাইবার চেষ্টা করে, তাহাদের এই দণ্ড দেওয়া হয়।

কৃষ্ণা শাস্তির কথা শুনিল বটে, কিন্তু তথাপি তাহার মন হইতে পলায়নের সঙ্কল্প দূর হইল না।

সেদিন রাত্রে—

সীতারাম আহার্য্য লইয়া আসিয়া ডাকিতেছিল—কৃষ্ণা ঘুমের ভাণ করিয়া বিছানায় পড়িয়া ছিল। সীতারাম বিছানার পাশে আসিয়া মুখ নিচু করিয়া ডাকিবার সঙ্গে-সঙ্গে কৃষ্ণা তীব্রবেগে উঠিয়াই তাহার গলা দুই হাতে চাপিয়া ধরিল এবং এমন একটা পেষণ কণ্ঠনলীতে দিল যে, সীতারাম হাত দিয়া তাহাকে ধরিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার হাত শিথিল হইয়া পড়িল এবং দমবন্ধ অবস্থায় সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

তখনও কৃষ্ণা তাহাকে ছাড়ে নাই, অসীম শক্তিতে তাহার কণ্ঠনলীতে পেষণ দিতেছিল। যখন বুঝিল সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহারই পরিধানের কাপড় দিয়া তাহার হাত ও পা শক্ত করিয়া বাধিল, মুখের মধ্যে খানিকটা কাপড় গুঁজিয়া দিল।

নিজে সে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; খানিকটা হাঁফাইয়া তাহার পর সীতারামের টর্চ্চটা লইল। তাহার পকেটে যে একটা ছোরা ও রিভলভার ছিল, কৃষ্ণা তাহা লইয়া ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া আস্তে-আস্তে বাহির হইল। দরজার তালায় চাবিটা লাগানো ছিল, সে দরজায় চাবি দিয়া পাশের দিকে অগ্রসর হইল।

বোধ হয় শুক্লা পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর রাত্রি, চাঁদের আলোয় চারিদিকটা দেখা যাইতেছিল। দক্ষিণে ছয়টি এবং বামে ছয়টি সারি-সারি মন্দির। সামনে দিয়া যাইবার ভরসা কৃষ্ণার হইল না, পিছন দিক দিয়া সে অগ্রসর হইল।

সীতারামের মুখে সে সকালে খবর পাইয়াছিল, এখানে আজ বেশী লোক নাই, দু-চারজন মাত্র আছে। মন্দিরের ও-ধারে একটা খোলা জায়গায় লণ্ঠন জ্বলিতেছিল, তাহার চারি পাশে পাঁচ-ছয়জন লোক বসিয়া ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ গান গাহিতেছে, কেহ চীৎকার করিয়া সা-রে-গা-মা সাধিতেছে। কৃষ্ণা বেশ বুঝিল, ইহারা কেহই প্রকৃতিস্থ নাই, সকলেই রীতিমত মাতাল হইয়াছে।

মন্দিরের পিছনে দারুণ অন্ধকারে কতকগুলা স্তূপীকৃত ইঁটে পা বাধিয়া কৃষ্ণা একবার হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে মাতাল লোকগুলা হল্লা করিয়া উঠিল। কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটু দূরে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে বসিয়া পড়িল।

পাঁচ-ছয়জন লোক লণ্ঠন লইয়া মন্দিরের পিছনে দেখিতে আসিয়াছিল; লণ্ঠন উঁচু করিয়া চারধার দেখিয়া একজন বলিল, "না, ও কিছু নয়; বনের মধ্যে জীবজন্তু আনাগোনা করছে; চল—ফেরা যাক।"

তাহারা ফিরিল, কৃষ্ণা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

আস্তে-আস্তে উঠিয়া সে আবার মন্দিরের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল—লক্ষ্য করিতে লাগিল লোকগুলা কি করে!

ঘণ্টাখানেক হল্লা করিয়া তাহারা পাশের একটা ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই, এই নদী পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে কেহ আসিয়া বন্দী ছেলেদের মুক্ত করিতে পারে !

খানিক পরে কৃষ্ণা আগাইয়া আসিল। যে ঘরে লোকগুলা প্রবেশ করিয়াছিল, সেই ঘরের দরজার ছিদ্রপথে উঁকি দিয়া দেখিল, লণ্ঠনটা মৃদুভাবে জ্বলিতেছে, চারজন লোক যে যেখানে পারিয়াছে পড়িয়া ঘুমাইতেছে ; তাহাদের নাক-ডাকার শব্দে মনে হয় যেন মেঘ গর্জ্জন করিতেছে !

নিঃশব্দে কৃষ্ণা সরিয়া পড়িল।

সীতারামের চাবির থলো সে পাইয়াছে। এক মুহূর্ত্তে টর্চ্চের আলোয় চাবি দেখিয়া লইয়া সে একটা মন্দিরের দরজা খুলিয়া ফেলিল—

—"কে ?"

কণ্ঠস্বর পরিচিত।

—"দেবু ?"

সঙ্গে-সঙ্গে কৃষ্ণা টর্চ্চ জ্বালিল।

দেবুই বটে, সে ধড়-মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল—চীৎকার করিতে যাইতেছিল, কৃষ্ণা খপ করিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, "চুপ্—আমি কৃষ্ণা দি'। শাগ্‌গির বার হয়ে এসো, একটু দেরী করো না।"

দেবু প্রস্তুত—লাফ দিয়া উঠিল।

—"কিন্তু এই সব জায়গায় আরও যে পাঁচ-সাতজন ছেলে আছে কৃষ্ণা দি'! ওদের নিয়ে যাবে না?"

কৃষ্ণা অধীর হইয়া বলিল, "এখন থাক্, পরে পুলিশ নিয়ে এসে ওদের নিয়ে যাব—এদের দলশুদ্ধ ধরব। তুমি এসো—ছুটে চল, আমাদের নদীর দিকে যেতে হবে। শুনেছি নদীতে সর্ব্বদাই এদের নৌকো থাকে, কোন রকমে নৌকো বেয়ে এখান থেকে পাঁচ-সাত মাইল দূরে গৌহাটীতে আমাদের পৌঁছাতে হবে। এসো—"

সামনে টর্চ্চের আলো ফেলিয়া কৃষ্ণা ও দেবু ছুটিল। জঙ্গল পদে-পদে বাধা দিতে লাগিল, কিন্তু আজ তাহারা কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না।

প্রায় এক মাইল ছুটিয়া তাহারা ব্রহ্মপুত্রের তীরে পৌঁছিল।

জলের কল্লোল ও স্রোত দেখিয়া দেবু আঁতকাইয়া উঠিল—"ওরে বাস্‌রে! এই নদীতে কি করে যাব কৃষ্ণা দি'?"

কৃষ্ণা ইতস্ততঃ টর্চ্চের আলো ফেলিয়া নৌকা দেখিতেছিল। সীতারামের মুখে সে শুনিয়াছে, এখানে নাকি এই দস্যুদলের যাতায়াতের জন্য সর্ব্বদা নৌকা বাঁধা থাকে। বলিল, "ভয় নেই, আমি তোমায় ঠিক নিয়ে যাব, আমার ওপর নির্ভর কর দেবু! আমি তোমায় ঠিক পৌঁছে দেব তোমার মা-বাবার কাছে।"

দেবুর চোখে জল আসিল, সে আবার পিতা-মাতার কোলে

ফিরিতে পাইবে! এ যে কি আনন্দ, তা বলা দুঃসাধ্য! কত কাল সে মাকে দেখে নাই, পিতাকে দেখে নাই!—

একটা গাছ নদীর বুকে ঝুঁকিয়া ছিল, তাহারই তলায় নৌকাখানাকে দেখা গেল।

কৃষ্ণা বলিল, "এসো দেবু, নৌকোয় ওঠো, আমি দাঁড় বাইতে জানি, তোমায় ঠিক নিয়ে যাব। এখন তোমার কোন কথা শুনব না, আগে গৌহাটীতে পৌঁছাই, এদের দলশুদ্ধ ধরিয়ে দেই, তারপর তোমার গল্প শুনব—আমার গল্প শুনাব।"

দেবুকে টানিয়া নৌকায় বসাইয়া দিয়া কৃষ্ণা নৌকা খুলিয়া দিল, ক্ষুদ্র নৌকা স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিল।

পনেরো

দেবুকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণা যখন গৌহাটীর একটা ঘাটে নামিল, রাত তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে, পথে লোক-চলাচলও কম পড়িয়াছে।

পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া কৃষ্ণা থানার খোঁজ পাইল।

আজ রাতটা কাটিয়া গেলে কাল ভোরেই দস্যুদল জানিতে পারিবে কৃষ্ণা পলাইয়াছে, একা যায় নাই, সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে দেবুকে—সর্দ্দারের আদেশে যাহার উপর সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল—যেহেতু তাহার মূল্য একদিন দশ হাজার টাকা হইলেও আজ মূল্য দাঁড়াইয়াছে কুড়ি হাজার টাকা।

আজ রাত্রেই আরাকানের সর্দ্দারকে লইয়া খাঁজাহান ফিরিবে। কাল সকালে যখন কৃষ্ণার ঘরে হাত-পা বাঁধা সীতারামকে দেখিতে পাইবে, দেবুর শূন্য ঘর দেখিবে, তখনই সে সেখানকার আড্ডা তুলিবে, তাহাকে ধরা এবং হতভাগ্য আর কয়েকটি শিশুকে মুক্তি দেওয়া আর হইবে না।

ইনস্পেক্টার স্থরঞ্জনবাবু আবশ্যকীয় কাজ সারিয়া কেবল-মাত্র উঠিতেছিলেন, এমনই সময় কৃষ্ণা দেবুকে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিল।

এত রাত্রে একটি মেয়ে দেখা করিতে চায়—নিশ্চয়ই

বিপদগ্রস্তা হইয়া আসিয়াছে। সুরঞ্জনবাবু তাহাকে তাঁহার নিকট আনিতে আদেশ দিলেন।

কৃষ্ণা ও দেবু আসিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণা একটা নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নামই বোধ হয় সুরঞ্জনবাবু, এই থানার ইন্‌স্পেক্টার ?"

সুরঞ্জনবাবু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমিই সুরঞ্জন গুপ্ত। আমিও জানতে চাই আপনি আর এই ছেলেটি কি দরকারে এত রাত্রে আমার কাছে এসেছেন ?"

একটা দম্ লইয়া কৃষ্ণা বলিল, "বলছি। আমার নাম কৃষ্ণা চৌধুরী, আর এই ছেলেটি বসিরহাটের এস. ডি. ও. মিঃ মিত্রের ছেলে দেবীপ্রসাদ মিত্র। যাকে খুঁজে বার করবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, আর প্রত্যেক থানায় জানানো হয়েছে—আপনিও নিশ্চয় তা জানেন।

—"ও হো—আর বলতে হবে না মা লক্ষ্মি, আমি চিনেছি—চিনেছি! তাহলে আমি তোমায় 'তুমি' বলেই সম্বোধন করবো। বসো মা, এই চেয়ারখানায় বসো ; খোকা, তুমিও বসো।"

সুরঞ্জনবাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

কৃষ্ণা বলিল, "আমরা বসতে আসিনি, আপনাকে পুলিশ নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই যেতে হবে—খাঁ জাহানকে দলশুদ্ধ গ্রেপ্তার করতে হবে। আজ এখনই যদি না যান, আর কখনও তাকে ধরতে পারবেন না, তার দলের লোকদেরও নয়। কাল ভোরে যখন তারা দেখবে, আমি নেই, দেবু নেই—সঙ্গে-সঙ্গে

তারা ওখানকার আড্ডা তুলবে ; যে ছেলেগুলিকে আজও তারা আটক করে রেখেছে, তাদেরও আর পাওয়া যাবে না।"

ইন্‌স্পেক্টার মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "খাঁজাহান! কোথায় সে? কোথায় গেলে তাকে দলশুদ্ধ ধরতে পারা যাবে বল তো?"

কৃষ্ণা বলিল, "আমি পথ চিনে এসেছি, আপনাকে ঠিক নিয়ে যেতে পারব। দেবু এখানে থাকবে—ওকে নিয়ে যাব না, কি বলুন?"

সুরঞ্জনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে যেতে হবে? এখান হতে সে জায়গা কতদূর?"

কৃষ্ণা বলিল, "দশ-বারো মাইল হবে মনে হয়। জায়গাটার নাম কি আমি জানিনে। ভয়ানক বন—আর তিন দিকে পাহাড়—একদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ। আমি ওদেরই নৌকোয় করে দেবুকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। স্থলপথ আছে কি না জানি নে, জলপথ দিয়ে আমি আপনাদের ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারব।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া সুরঞ্জনবাবু বলিলেন, "নিজে নৌকো বেয়ে দশ মাইল আসতে পারলে মা?"

কৃষ্ণা অধীর হইয়া বলিল, "আমি নৌকো বাইতে জানি। তা ছাড়া স্রোতের মুখে ভেসে আসতে বিশেষ কষ্টও তো হয় নি। আপনি আর দেরী করবেন না, ওরা এই রাতটুকু মাত্র ওখানে আছে। ঘড়ি দেখুন, বারোটা বেজে গেছে।"

সুরঞ্জনবাবু ব্যস্তভাবে উঠিলেন, বলিলেন, "তোমরা একটু

বসো, আমি লোকজন ঠিক করে নেই। মোটর-লঞ্চে যাব, বেশীক্ষণ দেরী হবে না পৌঁছাতে।”

তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

দেবু ভীত কণ্ঠে বলিল, “আমি তোমায় ছাড়ব না কৃষ্ণাদি’! তোমার সঙ্গে আমিও যাব।”

কৃষ্ণা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, “বোকা ছেলে! বুঝতে পারছো না, ওখানে গিয়ে তোমায় নিয়ে আমি আরও বিব্রত হয়ে পড়ব! তুমি এখানে কিছু খেয়ে দিব্যি আরামে ঘুমোবে। সকাল হতে-হতে ওদের দলকে দল গ্রেপ্তার করে নিয়ে আমি ফিরে আসব দেখো।”

দেবুকে দুধ খাওয়াইয়া শোয়াইয়া দিয়া কৃষ্ণা সুরঞ্জনবাবুর সহিত বাহির হইল।

কয়েকখানা লঞ্চ যোগাড় হইয়াছে, প্রত্যেকটিতে সশস্ত্র পুলিশ রহিয়াছে। পুলিশ-সাহেব নিজেও চলিয়াছেন; বিখ্যাত দস্যু খাঁজাহান যেন কোনক্রমে না পলাইতে পারে সে জন্য সকলকেই সন্ত্রস্ত ও সাবধান দেখা গেল। কতকগুলি জোরালো আলো লওয়া হইয়াছে, বনের মধ্যে কেহ যদি লুকায়, আলোর সাহায্যে ধরা যাইবে।

লঞ্চ চলিতে লাগিল—

সুরঞ্জনবাবু বলিলেন, “জায়গাটা আমি বুঝেছি, সেদিকে একবার আমরা শিকার করতে গিয়েছিলুম। কোন্ যুগের কয়েকটা ভাঙ্গা মন্দির সেখানে আজও আছে, দু-চারজন

ঐতিহাসিক সে সব সন্ধান নিয়ে গেছেন জানি। কিন্তু সে তো গৌহাটী হতে বড় কম দূর নয়, জলপথে অতখানি নৌকো বেয়ে আসাও কম শক্তির কাজ নয়! যাই হোক, এতদিন তোমার নাম শুনেছি, তোমার গল্পই শুনেছি, আজ চোখে দেখে বুঝছি, তোমার মত মেয়ের দ্বারা সবই সম্ভব। আমি প্রার্থনা করি, ঘরে-ঘরে তোমার মত অসীম শক্তিশালিনী মেয়ে জন্মাক; দেশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক মুছে যাক।"

কৃষ্ণা নিস্তব্ধে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিল, সুরঞ্জনবাবু পুলিশ-সাহেব মিঃ ব্রাউনকে কৃষ্ণার পরিচয় দিলেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃষ্ণা নিজের কাহিনী বলিল।

মিঃ ব্রাউন জিজ্ঞাসা করিলেন; "তুমি কতদিন এদের কাছে রয়েছো মিস্ চৌধুরী?"

কৃষ্ণা একটু ভাবিয়া বলিল, "আজ কত তারিখ তা আমার জানা নেই। মামার সঙ্গে যেদিন আমি বাগবাজারের খালধারে যাই, সেদিন ছিল বোধ হয় পাঁচই অক্টোবর। আজ কত তারিখ হলো বলুন তো?"

সুরঞ্জনবাবু বলিলেন, "তা প্রায় একমাস হলো আর কি! আজ নভেম্বরের তিন তারিখ হলো।"

কৃষ্ণা একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, "উঃ, আমাদের কলেজ কবে খুলে গেছে! আমার এতদিন শুধু-শুধু নষ্ট হলো।"

সে নিস্তব্ধে বাহিরের অথই জলের পানে তাকাইয়া রহিল।

ষোল

মন্দিরের সংলগ্ন একটা টানা লম্বা ঘর, জন-পনেরো লোক বসিয়া ছিল, মাথার উপর একটা পেট্রোম্যাক্স হুকে জ্বলিতেছিল।

রূপা ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল, "এই ঘরে প্রায় সবাই আছে। খাঁজাহান ওই মাঝখানে বসে। দেখুন, খুব বিশ্রী দেখতে—একটা চোখ নেই, কপালে একটা আব। ওরা এখানে ছিল না, রাত্রে ফিরবে শুনেছিলুম। ওর পাশে ওই আরাকানি সর্দ্দার বসে, ওরই কাছে আমায় বিক্রী করার কথা হচ্ছে শুনুন।"

জানালার ফাঁক দিয়া ঘরের সব দেখা যাইতেছিল, কথাও শোনা যাইতেছিল। বেশ বুঝা গেল, দর-দস্তুর হইতেছে। খাঁজাহান মোটা দর দিয়াছে, সর্দ্দার দু-এক হাজারের জন্য দর কষাকষি করিতেছে।

অবশেষে একটা মাঝামাঝি রফা হইয়া গেল। সর্দ্দারের সঙ্গে কয়েকজন সঙ্গী ছিল, সর্দ্দারের আদেশ পাইয়া তাহাদের মধ্যে একজন এক বাণ্ডিল নোট খাঁজাহানের সামনে রাখিল।

নোটগুলা তুলিয়া লইয়া গণিতে-গণিতে খাঁজাহান বলিল, "রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তোমরা এখনই মেয়েটাকে নিয়ে রওনা হতে পার। তবে ওকে খুব সাবধানে রাখবে,

একদিন সে বর্ম্মা-মুল্লুকে ছিল—ওসব দেশ তার বেশ জানা-শোনা আছে।”

—“বর্ম্মা মুল্লুকে ছিল ?”

আরাকানি সর্দ্দার বিস্ফারিত চোখে বলিল, “কোথায় ছিল ?”

খাঁজাহান বলিল, “রেঙ্গুনে। ওর বাবা মিঃ চৌধুরী সে-অঞ্চলে খুব নামকরা লোক ছিলেন, ডিটেক্‌টিভের কাজ সে তার বাপের কাছে শিখেছে। ওকে খুব সাবধানে না রাখলে এমনভাবে পালাবে সর্দ্দার, আর ধরতেও পারবে না। তোমায় আরও অনেক মেয়ে বিক্রি করেছি তো ! সে সব মেয়ে হতে এ মেয়ে একেবারে আলাদা, এ কথা সর্ব্বদা মনে রেখো।”

নোট গণিয়া খাঁজাহান নিজের বিশ্বস্ত অনুচরের হাতে দিয়া উঠিল, বলিল, “এতক্ষণ নিশ্চয়ই মেয়েটা ঘুমাচ্ছে ; ঘুমন্ত অবস্থায় ক্লোরোফরম দিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। রাত থাকতে-থাকতে এ-এলাকা ছাড়িয়ে যেয়ো সর্দ্দার, একবার তোমার এলাকার মধ্যে গিয়ে পড়লে—”

হঠাৎ সে স্তব্ধ হইয়া গেল।

জীর্ণ দরজার বাহির হইতে কে সজোরে আঘাত করিল, সে আঘাতে মুহূর্ত্ত-মধ্যে ঝন-ঝন করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন মিঃ ব্রাউন, পার্শ্বে সুরঞ্জনবাবু ও কৃষ্ণা, পশ্চাতে অগণ্য সশস্ত্র পুলিশ ! সকলেরই হাতে উদ্যত রিভলভার !

—"এ কি !"

খাঁজাহান চেঁচাইয়া উঠিল।

পাশেই একটা চৌকির উপর তাহাদের রিভলভার, ছোরা প্রভৃতি ছিল ; সেই দিকে অগ্রসর হইয়া মিঃ ব্রাউন বলিলেন, "সব মাথার ওপর হাত তোল, যে না তুলবে তাকে গুলি করে মারা হবে।"

প্রাণের মমতা মানুষের অত্যন্ত বেশী। তাই সকলেই, এমন কি দুর্দ্দান্ত দস্যু খাঁজাহান পর্য্যন্ত উপর দিকে হাত তুলিল।

পুলিশ হাতকড়া লইয়া অগ্রসর হইতেই, হঠাৎ আলোটা দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল, অন্ধকার ঘরে ছুটাছুটি, মারামারি, দাপাদাপি আরম্ভ হইয়া গেল, ইহারই মধ্যে কয়েকটা রিভলভারের গুলিও ছুটিল।

বাহিরে যাহারা অন্য ঘরের মাতাল লোক কয়টিকে আলোর সাহায্যে গ্রেপ্তার করিয়াছিল, তাহারা আলো লইয়া ছুটিয়া আসিল।

দস্যুদল অস্ত্র পায় নাই। অন্ধকারে অস্ত্র আহরণ করিতে গিয়া সুরঞ্জনবাবু, মিঃ ব্রাউন ও কৃষ্ণার গুলিতে কয়েকজন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে।

হাতাহাতি যুদ্ধেও দস্যুদল জয়লাভ করিতে পারিল না ; দশ-বারো মিনিটের মধ্যে সকলকেই হাতকড়া পরিতে হইল, পায়ে বেড়ি পরিতে হইল। কোমরে দড়ি বাঁধিয়া প্রত্যেক কনেষ্টবল প্রত্যেকটি কয়েদীর ভার লইল।

খাঁজাহান বিস্মিত-নেত্রে কৃষ্ণার পানে তাকাইয়া আছে দেখিয়া কৃষ্ণা একটু হাসিল, বলিল, "খাঁ সাহেব, আমি দেবুকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলাতে পালিয়েছি। তোমার সীতারামকে অজ্ঞান করে হাত-পা বেঁধে আমার বন্দীশালায় ফেলে রেখেছি, আমায় আনতে গেলে তাকেই দেখতে পেতে। তার চাবি দিয়ে দেবুর বন্দীশালার দরজা খুলে তাকে নিয়ে তোমাদেরই নৌকোয় গৌহাটী পর্য্যন্ত পৌঁছালুম। দেবুকে থানায় রেখে ইন্‌স্পেক্টার সুরঞ্জনবাবু, পুলিশ-সাহেব আর এই সব কনেষ্টবলদের পথ দেখিয়ে এনেছি।"

খাঁজাহানের একটা চোখ জ্বল-জ্বল করিয়া উঠিল, সে হাতকড়া-বাঁধা হাত দুখানা আন্দোলন করিয়া দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া কেবল বলিল, "শয়তানী!"

কৃষ্ণা বলিল, "শয়তানী ছাড়া শয়তানের কাজ পণ্ড করতে কেউ পারে না খাঁ সাহেব! আমাকে খুব চড়াদামে এই মগ-সর্দ্দারের কাছে বিক্রি করছিলে, আমার আগে আরও অনেক মেয়েকে বিক্রি করেছ; এই শয়তান সর্দ্দার আবার তাদেরকে কোথায়-কোথায় বিক্রি করেছে কে জানে! নিজের কথাতেই ধরা পড়ে গেছ খাঁ সাহেব, এবার আর জাহাজ থেকে পালাতে হবে না জেনো।"

খাঁজাহান গর্জ্জিয়া উঠিল, "আগে তোকে খুন করলেই ভালো হতো।"

সুরঞ্জনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা যখন করনি, এখন আর

পস্তানো মিথ্যে। তবে এটা সত্যি কথা, এবার তোমায় কি রকম পাহারায় কোথায় পাঠানো হবে সে সম্বন্ধে সরকার বাহাদুর বিশেষ সচেতন থাকবেন। বাইরে বেশ ফরসা হয়ে এসেছে, এখন তা হলে শিকল বাজিয়ে এসো।”

কৃষ্ণা নিজেই চাবি খুলিয়া বন্দীশালা হইতে আটটি ছেলেকে বাহিরে আনিল।

জীর্ণশীর্ণ তাহাদের চেহারা। নভেম্বরের এই শীতে তাহাদের একখানি করিয়া কম্বল সম্বল।

এই হতভাগ্য ছেলেগুলি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, সত্যই তাহারা মুক্তি পাইয়াছে! যখন তাহারা সত্য বলিয়া জানিল, তখন আনন্দে কেহ কাঁদিল, কেহ নাচিল, কেহ হাসিল।

এই আনন্দময় দৃশ্যে সকলের চোখেই জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

বেচারা সীতারামকে যখন টানিয়া বাহির করা হইল, সে শুধু হাঁউ-মাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহারও হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি, পায়ে বেড়ি পড়িল।

দলবদ্ধভাবে এতগুলা কয়েদী ঝম-ঝম করিয়া শিকল বাজাইয়া অগ্রসর হইল। পিছনে চলিতে-চলিতে মিঃ ব্রাউনকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণা বলিল, “আরও অনেকগুলি ছেলেকে পরশু আর কাল চালান করা হয়েছে। কোথায় দিয়েছে তা জানে একমাত্র খাঁজাহান। চেষ্টা করলে এখনও তারা মুক্তি পেতে পারে মিঃ ব্রাউন, তাদের পাওয়া যেতে পারে।”

এই মেয়েটির শক্তি, সাহস ও মার্জ্জিত কথাবার্ত্তায় মিঃ ব্রাউন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন ; বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব মিস্ চৌধুরী ! আশা করছি তুমি দু-চার দিন গৌহাটীতে থেকে দেখে যেতে পারবে।"

কৃষ্ণা মাথা নাড়িল, বলিল, "আমি আজই দেবুকে নিয়ে কলকাতায় ফিরব মিঃ ব্রাউন ! ওর মায়ের কাছে আমি কথা দিয়েছি—তাঁর ছেলেকে তাঁর কোলে ফিরিয়ে দেব। আমি আর এক দিনও কোথাও থাকতে পারব না। এর পরে যখন বিচার হবে, তখন আসব, এখন আমায় ক্ষমা করবেন।"

মিঃ ব্রাউন উজ্জ্বল চোখে কৃষ্ণার পানে চাহিলেন।

সতেরো

এ যেন স্বপ্ন!—

দেবুকে লইয়া কৃষ্ণা ফিরিয়াছে!

মিসেস্ মিত্র দেবুকে বুকের মধ্যে লইয়া নিঃশব্দে হু-হু করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। মিঃ মিত্র আনন্দে ছুটিবেন কি নাচিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া কেবল কৃষ্ণার হাত দুখানা চাপিয়া ধরিলেন। দেবু মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই ধাক্কা সামলাইতে খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল।

মিসেস্ মিত্র দেবুকে ছাড়িয়া কৃষ্ণাকে কোলে টানিয়া লইলেন, তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তোমায় কি বলে আশীর্ব্বাদ করব মা, তা আমি নিজেই ঠিক করতে পারছি নে। তোমার কথা তুমি রেখেছো, তুমি জীবন্ত দেবুকে আমার কোলে ফিরিয়ে এনে দিয়েছো। আমার—"

কৃষ্ণা তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল, বলিল, "আশীর্ব্বাদ করুন, আমার যেন এই রকমই শক্তি ও সাহস থাকে, যেন প্রত্যেকের উপকারে লাগতে পারি, নিজের জন্ম যেন এমনি করে পরের কাজে সার্থক করতে পারি, আর বাঙ্গালী মেয়ের ভীরুতার অপবাদ ঘুচাতে পারি!"

মিঃ মিত্র এতক্ষণে একটা সিগার ধরাইবার অবকাশ

পাইলেন ; একটা কাজ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি উঠিয়া ড্রয়ারটা খুলিয়া একটা ছোট স্যুটকেশ বাহির করিয়া কৃষ্ণার সামনে রাখিয়া বলিলেন, "এতে দেবুর মুক্তিপণ সেই দশ হাজার টাকার নোট আছে। তোমার মামা হসপিটাল হতে ফিরে আমায় দিয়ে গেছেন। আমি এ টাকা রেখে দিয়েছি, যে দেবুকে এনে দেবে তাকে দেব প্রতিজ্ঞা করেছি। এ টাকা তোমাকেই নিতে হবে কৃষ্ণা !"

সঙ্কুচিতা কৃষ্ণা বলিল, "আপনি ওকথা বলবেন না মেসো-মশাই! আমার ভাই নেই, দেবুকে আমি নিজের ভাই বলেছি, তাকে উদ্ধার করতে পেরেছি, সে জন্যে আপনার কাছ হতে টাকা নেব—ছিঃ !"

মিসেস্ মিত্র সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন, বলিলেন, "টাকা থাক্, ওতে কয়েকখানা ডায়মণ্ড কিনে আমি একটা হার গড়িয়ে কৃষ্ণার গলায় পরিয়ে দেব।"

তাহাই ঠিক হইল।

কৃষ্ণা সেদিন বাড়ী আসিতে পারিল না। মিঃ মিত্র প্রণবেশকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, "বিশেষ দরকার, এখনই আসা চাই।"

চাপরাশির সঙ্গে প্রণবেশ আসিয়া পৌঁছিলেন; তারপর বিশেষ ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দরকার মিঃ মিত্র? ওদের কোন খবর পেয়েছেন কি ?"

মিঃ মিত্র বলিলেন, "বসুন তো, আপনাকে একটা মজার ব্যাপার দেখাব।"

পাশের দরজাটা আস্তে-আস্তে খুলিয়া গেল, সেখানে দেবুর হাত ধরিয়া কৃষ্ণা সহাস্যমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

—"কৃষ্ণা !—দেবু !"

প্রণবেশ চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন।

কৃষ্ণা ও দেবু প্রণবেশকে প্রণাম করিল। প্রণবেশ দুই হাতে দুজনের হাত ধরিয়া সজলনেত্রে তাকাইয়া রহিলেন।

মিঃ মিত্র বলিলেন, "কৃষ্ণা যা করে দেবুকে এনেছে, সে এক অলৌকিক গল্প প্রণবেশবাবু! আমরা কতকটা শুনেছি, আপনিও খাওয়ার টেবিলে বসে শুনবেন।"

রুদ্ধশ্বাসে প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাকাতের দল আছে না গেছে ?"

কৃষ্ণা বলিল, "দলকে দল ধরা পড়েছে, গৌহাটীর জেলে আছে। বিচারের সময় দেবু আর আমি সাক্ষ্য দিতে আবার যাব। দেবু তখন কাম্যাখ্যা পাহাড়, উমানন্দ, ভুবনেশ্বরীও দেখবে কিনা।"

প্রণবেশ বলিয়া উঠিলেন, "আমিও তোদের সঙ্গে যাব।"

মিসেস্ মিত্র হাসিমুখে বলিলেন, "যদিও দরকার নেই এ মেয়ের বডিগার্ডের, তবু আমরা দুজনেও সঙ্গে যাব প্রণবেশ বাবু! একটা দল বেঁধে বেশ হৈ-হৈ করতে-করতে যাওয়া যাবে, কি বলুন ?"

প্রণবেশ মহা খুসি হইয়া হাসিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য—সংবাদ পাইয়াই ব্যোমকেশও ছুটিয়া আসিলেন। কৃষ্ণা ও দেবুর মুখে তিনি সব গল্পই শুনিলেন, কিন্তু খুসি যে হন নাই, তাহা তাঁহার অন্ধকার মুখ দেখিয়াই বুঝা যায়।

তিনি গম্ভীর ভাবে কেবল বলিলেন, "হুঁ, মেয়েদের অত সাহস ভালো নয়।"

কৃষ্ণা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ করুন,, বাংলার সকল মেয়ের বুকেই যেন এই রকম শক্তি ও সাহস জাগে, বাংলা যেন আবার বীর জননীতে ভরে ওঠে।"

শেষ

RADHIKA

'প্রহেলিকা-সিরিজে'র দ্বাবিংশ গ্রন্থ'

হাওয়ার পিছনে

রচনা :—শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

প্রায় প্রত্যহই খুন ! ডাকে আসে ছিন্নমুণ্ড উপহার ! মুখ তার হাসিমাখা—

সহরের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা যেদিন এই তদন্তের ভার হাতে নিলে, সেদিন হ'তে তারও সুরু হলো কত নব-নব অপূর্ব্ব রহস্যের অভিজ্ঞতা। কেউ নেই, অথচ মাঝে-মাঝে কে যেন তাকে নাম ধরে ডাকে কে তাকে লুকিয়ে চিঠি দিয়ে যায়! গাড়ীর ভেতর উন্মাদ জনতা কেমন হিংস্র ভাবে তার দিকে এগিয়ে আসে! গভীর রাতে কে যেন তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ঘুম-পাড়ানো গান গেয়ে যায়!

কে সে? কি তার স্বার্থ? সেই কি খুনী? নিহতের মুখেই বা হাসি কেন?—

সব কিছুরই সন্ধান আছে **হাওয়ার পেছনে!**

দাম—এক টাকা

বাংলার সমস্ত বইএর দোকানে পাওয়া যায়।

দেব সাহিত্য-কুটীর : ● : ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯